॥ অন্যদের ছন্দ ॥

॥ জনপদের ছন্দ ॥
॥ রাহুল ॥
॥ রমেন্দ্র দেশমুখ্য ॥
॥ অগ্রণী বুক ক্লাব ॥
॥ কলিকাতা-৬ ॥

প্রকাশক
প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
শ্রীশশধর চক্রবর্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী
ব্লক ও কভার
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫
সাড়ে তিন টাকা

ঘুরে-বেড়ানোটা আমার নেশা এবং পেশা। তাই ভারতের নানা জায়গা আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। মাঝে মাঝে ক'লকাতা এসে বিশ্রাম করি। এবং আবার কিছুদিন পরে বেরিয়ে পড়ি। বছরের পর বছর এভাবেই আমার কাটছে।

আমার চলাটা কিন্তু পরিব্রাজকের একটানা চলা নয়। একটানা চললে ভ্রমণের একখানি ডায়েরী তৈরী করা যায়। তাতে ভ্রমণপথের একটা সূত্র মিলে। সন, তারিখ এবং বারের সঠিক হিসেবের মধ্য দিয়ে যাত্রা-পথের আনুপূর্বিক বর্ণনায় একটা সুখপাঠ্য বিষয়ের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আমার চলাটা বেখাপ্পা। ক'লকাতাকে কেন্দ্র করে কখনো গেছি দক্ষিণে, কখনো পশ্চিমে, আবার কখনো উত্তরে বা পুবে। চলার সময় অনুভব করেছি বিভিন্ন জনপদের উদ্ভিন্ন ছন্দকে। আর সে-ছন্দ বিধৃত হয়েছে মানুষের আশা-আশংকার ভেতর।

এগ্রন্থে আপাত-দৃষ্টিতে সূত্র কেবল আমিই। যে-লেখক যাযাবরের মত ঘুরছে, দেখছে এবং অনুভব করছে, সেই কেবল আদ্যন্ত বর্তমান। অন্যান্য পাত্রপাত্রী যেহেতু দেশে দেশে ছড়িয়ে আছে, সেহেতু পরস্পরের সংগে ওরা অপরিচিত। এ যেন অনেকটা মিছিলের মত। নানা জায়গার মুখ এসে গেছে। কেবল এক নায়ক-নায়িকার সুখদুঃখ এ বইখানিতে তাই নেই।

এ-ধরনের বারোয়ারী রম্য-রচনার সংগে সাধারণ পাঠকসমাজ হয়ত' তেমন পরিচিত নন। কাজেই এক প্রসংগ থেকে আর এক

প্রসংগে যেতে খানিকটা হোঁচট খেতে পারেন। সেজন্য প্রত্যেকটা রচনাকে যথাসম্ভব গল্পের ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেছি। যাতে পাঠক অন্তত সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, তিনি একঝাঁক ছোট গল্প পড়ছেন। এবং সবকটি গল্পই প্রায় স্বসম্পূর্ণ।

গ্রন্থের অনেক পাত্র-পাত্রীই আমার চোখে দেখা। কিছুটা শোনা আর বাকীটা কল্পনা মিশিয়ে ভ্রমণ-কথার কলেবর বৃদ্ধি করেছি। বলা বাহুল্য যে, আমার রচনার গণ্ডী আমার দেশ, অর্থাৎ ভারতবর্ষ।

সব শেষে ঋণ স্বীকারের পালা। ইংরাজী এবং বাংলা, বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা থেকে মাঝে মাঝে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে নিতে হয়েছে। বইগুলির তালিকা এখানে পেশ করছি না বটে, কিন্তু মনে মনে আমি ঠিকই ঋণ স্বীকার করছি।

'অগ্রণী' সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্ল রায় এ-ধরনের রম্যরচনা লেখার জন্য দিনের পর দিন আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আমার মেয়ে ইনা দেশমুখ্য রাত্রি-জাগরণ করে' করে' প্রুফ-দেখায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বন্ধুবর রবিঘোষের সংগে আলোচনা করে কয়েকটা লেখার খানিকটা গতি-নির্ণয়ে সাহায্য পেয়েছি। লেখাটি মাসিক অগ্রণীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫
ক'লকাতা

রাহুল (রামেন্দ্র দেশমুখ্য)

॥ মায়ের উদ্দেশে ॥

নাগা পাহাড়ে

॥ এক ॥

পথের শেষ নেই।

ক'লকাতার গলি থেকে বেরিয়ে আমি যে কত পথ ঘুরেছি। সে পথ কখনো গেছে নিজাম-প্রাসাদের পেছনে, আমীব-ওমরাহের আবাস ছাড়িয়ে তালীবনে। দক্ষিণী-তরুণীর জন্ম-জন্মের হতাশায় আচ্ছন্ন গ্রেনাইট পাথরের ওপব দিয়ে রুক্ষ পথ।

আবার কখনো সে পথ গেছে চা-বাগানের ভেতর দিয়ে। চা-চারা রোপণের দিন থেকে বাপ মা যেখানে শিশুর জন্মদিন গণনা কবে। খড়ের ছাউনি দেয়া, নোংরা ভুবভুর গন্ধবহ কুটিরে বিচালির ওপর শিশুর জন্ম যেখানে।

চলতে চলতে আমি হাজার ঘটনার নায়ক নায়িকার সংগে পরিচিত হয়েছি। ক'লকাতা কিংবা বম্বের স্টুডিওতে তোলা নায়ক নায়িকার সংগে নয়। সুন্দরবনে যে নায়িকা বিদ্যাধরীকে আমি একদিন অবাক হয়ে দেখেছিলাম, সে বিদ্যাধরী সোমবার, মংগলবারের হিসেব বাখত চাঁদের সংগে জলের যোগাযোগ করে। অর্থাৎ, পূর্ণিমা-অমাবস্যায় লোনা জলের জোয়ার-ভাঁটা দিয়ে।

ঠিক এ রকম চলতে চলতে আমি একদিন ডিব্রুগড় ছেড়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দিকে রওনা হলাম। মানচিত্রের আসাম যেখানে ঈগল পাখীর মত ঘাড় বেঁকিয়েছে, সেই তার ঠোঁটের দিকে। ব্রহ্মপুত্রের ওপারে পূর্ব-হিমালয় পর্বতমালা। ঐ দিকটায়ইতো সদিয়া

ফ্রন্টিয়ার। শীতের দিনে রোদ্দুর পড়েছে পাহাড় চূড়ায়। গত ভূমিকম্পে যে পাহাড় ভেঙে ভেঙে গিয়েছিল, তা দেখা যায় এপার থেকে।

অনেকটা 'স্নোজ অব কিলিম্যানজ্ঞোরো'র মত। আর্ণেস্ট হেমিংওয়ে মার্কিন মুলুক ছেড়ে তাঁর উপন্যাসের পটভূমি খুঁজতে এরূপ পাহাড়ের পেছনেই তুনিয়া ঘুরেছিলেন। এই সেদিনও তিনি তুবার বিমান-তুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলেন।

হিমালয়ের ওদিকটায় বসবাস করে পাহাড়ী মিরিরা। ওরা কতখানি মানুষখেকো, তা জানা নেই। তবে মানুষ খুন করতে ওরা বিবেকের থোড়াই পরোয়া করে। হিমালয় অঞ্চলের পাহাড়ী তাগিনরা উনিশশ' তিপ্পান্ন সালে ভারতীয় মিলিটারী বাহিনীর বেশ কয়েকটি বাছাই করা মাথা কেটে নিয়ে গভীর জংগলে সরে পড়েছিল। নরমুণ্ড শিকার। ওরা হয়ত' সেই মাথা দিয়ে মালা তৈরী করেছিল সর্দারের জন্য। নয়ত' সর্দার-কন্যার বিয়েতে গ্রামের যৌতুক হিসেবে ধরে দিয়েছিল।

কতদূরে হবে সেই তাগিনদের মুলুক। পথ চলতে সেই কথাই ভাবছিলাম। পথ গেছে চায়ের বনের ভেতর দিয়ে। তুধারে ইংরাজের মালিকানায় বেড়ে উঠেছে চায়ের বাগান। আমাদের বাস সেই পথ দিয়ে ছুটছে। শিরীষ বন। তুদিকে চায়ের বনে আবক্ষ ডুবিয়ে কালো কালো, ঝাঁক ঝাঁক চায়ের মেয়ে, পংগপালের মত। মাঝে মাঝে ঝক্‌মকে দামী গাড়ীগুলো বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসে। সেগুলোর ভেতরে শোভা পায় ইংরাজ যুবতী। হয়ত' কানের উপর সকালের রোদে এক বিন্দু মুক্তোর অলংকার ঝকমক করে। তারপরেই গাড়ী অদৃশ্য হয়। তখন জেগে থাকে কেবল চায়ের কালো কিশোর-কিশোরী। কবে কোন পিতামহী তার

আদিবাস ছেড়ে দিয়ে রিক্রুট হয়ে এই বাগানে এসেছিল। সেই পিতামহী তৈরী করেছে অপুষ্টযৌবন এই ব্যাঙাচির মালা বংশসূত্রে।

আমাদের বাস চলেছে। পথের বাঁক ঘুরলে যে মোহনবাড়ি এরোড্রম পাওয়া যাবে, তাকে কেন্দ্র করে আমি একদিন সাংবাদিকরূপে হিমালয়ের চূড়া ঘুরে এসেছি বিমানে। সেদিন ডাকোটা বিমানে বসে আমি মেঘলোক ছেড়ে ইন্দ্রলোকের কাছাকাছি হয়েছিলাম। তুষারময় চূড়াগুলোতে দেখেছিলাম সাত রঙের লীলা। সে বেশ কয়েক বছর আগে। সেদিন দফ্‌লা আর মিরির মুলুক শূন্যপথে পেরিয়ে গিয়েছিলাম। দূরবীন দিয়ে দেখছিলাম, ছড়ানো নদী-উপনদীর উপত্যকায় প্রায়-উলংগ ফর্সা নরনারী জমায়েৎ হয়ে আছে। হয়ত' আমাদের বিমানের শব্দ ওদের ঘর থেকে পথে বের করেছিল। ওরা কারা? যুগযুগান্ত ধরে যারা হিমালয়ের তুষারকারাকে প্রিয় জন্মভূমি বলে মেনে নিয়েছে। তেনজিং-এর মত তুষারকে জয় করে আবার উষ্ণ-সমতলে ফিরে যাবে না। সেদিন মনে হয়েছিল, একবার মহাশূন্যে ঝাঁপ দিলে কেমন হয়? ইংরাজ পাইলটটি বলেছিল, মরতে চাও তো পক্ষীরাজ ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিই ঐ বরফের পিরামিডের দিকে। ওদিকে চীন থেকে আসছে গলগল করে গোঁয়ারের মত হাওয়ার স্রোত।

সেদিন সেই এ্যাডভেঞ্চার করিনি। পৃথিবী ছাড়িয়ে, মেঘমণ্ডল ছাড়িয়ে, একেবারে নিরাসক্ত হয়ে জীবনের মূল্য যাচাই করেছি। জীবন কত প্রিয়তম। ছোটবেলায় এক নদীর খরস্রোতে ডুবতে ডুবতে বুঝেছিলাম যে, মৃত্যুর মুখোমুখী হলে বাঁচবার তাড়না সব কিছু ছাপিয়ে উঠে।

ইদানীং নাগা শুভেচ্ছা মিশন আসাম সফরে বেরিয়েছে। শুভেচ্ছা মিশনের বন্দোবস্ত করছেন স্থানীয় হর্তাকর্তারা। স্বতন্ত্র নাগারাজ্য

স্থাপনের জন্য সংগে নাগকন্যা উলুপী। মহাভারতের এই উপমা হয়ত' বিসদৃশ হল। কিন্তু নাগা শুভেচ্ছা মিশনের সংগে মধ্যমণি ছিলেন একটি নাগা নারী। তিনি ইংরাজী জানেন।

ক'লকাতার কাগজওয়ালারা ঢাকঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করল, সমস্ত ব্যাপারটাই মার্কিন মিশনারীর কারসাজী। স্বতন্ত্র নাগারাজ্যের কল্পনা কেবল মিশনারীদের মগজ থেকেই বেরিয়েছে।

ঠিক ঐ সময়েই তিনদিনে তিনসুকিয়ার কাজ শেষ করে আমি রেলগাড়ীতে আসছিলাম মণিপুররোড। রাত পোহাল মণিপুর রোড এসে। এখান থেকে মোটরবাসে চড়ে আমাকে নাগাপাহাড়ে ঢুকতে হবে।

গভীর জংগলের ভেতর দিয়ে পথ। পথ কিন্তু পিচঢালা। সেই আঁকাবাঁকা পথে আমাদের যাত্রী-বোঝাই বাস চলছে হন্ হন্ করে। এক দিকে পাহাড়ী নদী। নদীর কাছে গা ঘেঁষে ঘেঁষে লোমশ পাহাড় ক্রমাগত আকাশে উঠে গেছে। অন্যদিকে আগুনে ঝল্সানো গাছের শত শত কালো কংকাল। যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভূতি।

বছর চব্বিশ বয়সের একটি নাগা নার্স আমার সামনের সীটে বসে আছে। ওকে আমি খানিকটা চিনি। জোড়হাটের এক মার্কিন মিশনারী হাসপাতালে ও কাজ করে। ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে। বেশ ইংরাজী বলতে পারে মেয়েটি। মণিপুর রোড স্টেশনে যখন একই বাসে আমরা উঠতে যাচ্ছি, তখন ও-ই আমাকে ডেকে জিগ্‌গেস করেছিল—"হ্যাল্লো, আমাকে চিনতে পারেন?"

"হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। আপনিই তো জোড়হাটের হাসপাতালে ডাক্তার সাহেবকে দেখা করার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।"

"বেশ মনে আছে দেখছি", মেয়েটি বললে।

"কিন্তু আপনার যে মনে আছে, সেইটেই তো আশ্চর্যের বিষয়।" হেসে ওকে কথা কয়টি বলেছিলাম।

তারপর আলাপ বন্ধ হয়ে গেল। বাস নাগাপাহাড়ের পথে যতই উঠতে লাগল, ততই দেখি ওর মুখ চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সে তখন স্বয়ং-সম্পূর্ণা। কতকাল পরে দেশে ফিরছে। দেশে কত প্রিয়জন আছে।

একটানা অনেকক্ষণ চলতে চলতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাস এক জায়গায় থামল। পথের ধারে কয়েক পরিবার পাহাড়ীদের আস্তানা। বন ছেড়ে পথের ধারে ওরা বসতি করেছে। নৃতত্ত্বের মতে নাগারা প্রত্ন-মোংগোল-রূপ উপজাতি। চোখের খোল বাঁকা, চাপা নাক, চোখের কোণে ভাঁজ, গায়ে অল্প লোম, চিবুকের উঁচু হাড়। ওরা তিব্বতী-চীনা ভাষাভাষী।

নাগা নার্স টি এবার হাত দিয়ে আমাকে ঠেলে দিলে। বললে—"আপনি ক'লকাতার লোক ; সত্যি বলুন, পাহাড়ীদের কেমন লাগছে আপনার ?"

"চমৎকার। ভারী সুন্দর।"

মেয়েটি আরো খুশি হয়ে গেল। বললে, "বাঙালী বা অসমীয়ারা অনেকেই নাগাদের অসভ্য বলে ঘৃণা করে। কথায় কথায় নাগাদের জংলী বলে ওরা। আপনি ঠিক ঐ ধাতের লোক নন। সেই জন্য আপনাকে বড় ভালো লাগছে।"

একটু যেন লজ্জিত হলাম। তারপর লজ্জা কাটিয়ে বললাম—"আমাকে বিশ্বাস করুন, আপনি জানেন না, কিন্তু অনেক অনেক বাঙালী ও অসমীয়া আছেন, যাঁরা আপনাদের শ্রদ্ধা করেন এবং ভালোবাসেন।"

মেয়েটি খুশি হল। খুশির আতিশয্যে সে জানালা দিয়ে বনের দিকে চেয়ে হাসিকে আড়াল করল।

"কি হল, হাসছেন যে ?" শুধালেম।

"আপনার 'শ্রদ্ধা' কথাটি শুনে হাসছি," সে জবাব দিলে।,

বললাম—"এতে সন্দেহ করবেন না। নাগারা যেদিন থেকে রাজনীতির আসরে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করেছে, সেদিন থেকেই আমরা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করছি। কই, আর কোনো পাহাড়ীরা এমন সভা, মিছিল করতে পারল কোথায় ? একটা শুভেচ্ছা-মিশনকে সারা আসাম ঘুরিয়ে আনল নাগারা। দাবী করল স্বাধীন নাগা-রাজ্যের। সে কী পাহাড়ী জাতির বুদ্ধির সাংঘাতিক উন্নতি না হলে সম্ভব ?"

"কিন্তু ক'লকাতার কাগজওয়ালারা তো বলেন যে মিশনারীদের বুদ্ধিতেই নাগারা উস্কেছে।" মেয়েটি বললে।

হঠাৎ অবাক হয়ে গেলাম। হাসপাতালের একটি পাহাড়ী নার্স আমার চিন্তাকে মৃদু চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে দেখে বিস্মিত না হয়ে যাই কোথায়। মেয়েটির ইংগিতের ভালোমন্দ বিচার করে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। আর আমি যা বলব, তাতে ও খুশি হতে নাও পারে।

"কি, কথা বলছেন না যে ?"

"বাসের ভেতর বিতর্ক সুবিধে হবে না," বললাম।

মেয়েটি সায় দিয়ে বললে—"ঠিকই বলেছেন।"

এবার নীরবতা। কথায় এক পশলা বৃষ্টির পর মুক্ত হল মন। ঘন বনেব ভেতর দিয়ে বাস অনবরত এগিয়ে যাচ্ছে। এবার নিয়ে আমার দ্বিতীয়বার কোহিমার পথে যাত্রা। আড়চোখে দেখলাম, মেয়েটিও নিজের সীটে বসে উন্মনা হয়ে গেছে।

পথে যেতে যেতে হাজার হাজার দৃশ্য চোখে পড়ে। আদিবাসীদের জীবনযাত্রার টুকিটাকি। মনের সামনে সারা ভারতের আদিবাসীরা

ভিড় করে। শহরে থাকে সভ্য নাগরিকা—রঙীন নখ, রঙীন ঠোঁট, দামি শাড়ী, চোখে কাজল। আর পাহাড়ে অমার্জিত বেশ, অসংস্কৃত কেশ, ত্রস্তপদী রমণী। উভয়েই সুন্দরী। বন্যেরা বনে, নাগরিকারা নগরে।

চট করে উন্মনা হয় মন। বিহারের খনিতে কাজ করে যে কৃষ্ণাংগ আদিবাসী, সেও একদিন জংগলে ছিল। আসামের চা বাগানে কাজ করে যে কুলী, তাকেও রিক্রুট করা হয়েছিল ছোটনাগপুর কিংবা সাঁওতাল পরগণা থেকে।

চোখের সামনে ভাসে ত্রিবাংকুরের কফির বাগিচা। সেখানেও মালিকানা বিদেশীর। আর সেই বাগিচায় কাজ করে মাথায় ছোট ছোট পাকানো চুল কাডব যুবক। কোচিন পর্বতে তার সগোত্রেরা এখনো জংলী। কিন্তু সে এসেছে কফির বাগিচায়। এসে অবধি প্রায দাস হয়ে গেছে। দেহে শালগ্রাম শিলার রঙ, ঠোঁট পুরু ও উল্‌টানো, নাক চেপ্টা ও চওড়া। তার ভাযাভাষী নিগ্রোবটু শ্রেণীর লোকেরা আন্দামানের জংগলে মাথায় ঝিজলি চুল নিয়ে আজও লুকিয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে ওদের শাখা-প্রশাখা নিউগিনী, ফিলিপাইন, মালয়ের অরণ্যে অরণ্যে।

তেমনি লুকিয়ে আছে দক্ষিণ ভারতের জংগলে আদিঅস্ট্রাল রূপ শ্রেণীর পুলায়ান বা উরালি রমণী। ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, আচার-ব্যবহার-ভাষায় অদ্ভুত, ব্যাধকন্যারা। এদেরই একদলের বর্ণনা সম্ভবত বাণভট্ট কাদম্বরীতে করে গেছেন। এদেরও একটা বিরাট ব্লক আছে। সে ব্লকটা ছড়িয়ে আছে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, মেলানেশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার অরণ্যে।

বাসে যেতে যেতে পথের দুধারে যাদের চোখে পড়ছে, তাদেরও একটা ব্লক আছে। সে ব্লকটা ছড়িয়ে আছে তিব্বতে, চীনে,

পূর্বসাইবেরিয়ায়, সিকিমে, ভুটানে, বর্মায়। নাগারা মোংগোল জাতির একটি প্রশাখা।

কিন্তু আমি? আমি কি? আমি হয়ত আলপোদিনারীয় শ্রেণীর লোক। আর আমার স্ত্রী বা কন্যা ভূমধ্যশ্রেণীর।

নিজের মনেই হেসে উঠি। মিশ্রণ, সর্বত্র মিশ্রণ। বুদ্ধিতেও আমি মিশ্র জীব। সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মিশ্রণ চলছে। কোথায় মিশ্রণ নেই? আলংকারিক শিল্পকলার দিকে চেয়ে দেখুন। অজন্তা গুহার শীর্ষদেশে চাঁদোয়ার মধ্যে এক-একটা করে শ্বেতপদ্ম বিকশিত আছে। আবার ফতেপুর সিক্রীতে এসে দেখুন মুসলমানী প্রাসাদে পদ্মফুলের কারুকার্য। হিন্দু-বৌদ্ধ-মুস্‌লিম ভাস্কর্যের মিশ্রণ।

"শুনুন, মিস্টার," মেয়েটি কাকে যেন ডাকল।

শব্দে সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখি আমাকেই ডাকছে নার্স মেয়েটি।

"আমাকে কিছু বলছেন?" শুধালেম।

"হ্যাঁ, আপনি কি সোজা হোটেলেই চলে যাবেন?"

হেসে জবাব দিলাম, "হাঁ।"

"কিন্তু, আমার একটা কথা ছিল", সে বিনীতভাবে বললে।

"কি কথা?"

"আমাদের বাস তো সাড়ে এগারোটার মধ্যে কোহিমা পৌঁছুবে। এবং তার দেরীও নেই আর। আমি বলি, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তবে একরাতের জন্য নাগাপাহাড়ে আমার অতিথি হোন।"

প্রস্তাব শুনে অবাক হলাম। বাংলাদেশের যে রীতিনীতিতে আমি অভ্যস্ত, সে রীতিনীতি এখানে অচল—তা জেনেও আমি অবাক হলাম। পাহাড়ী কন্যার বেপরোয়া ভাব আমাকে যেমন অবাক করল, তেমনি মুগ্ধ করল ওর প্রস্তাব দেবার অকুণ্ঠ ভংগিমা।

"দেখি, বাস তো কোহিমায় পৌঁছুক।" হেসে ওর দিকে চেয়ে জবাব দিলাম। ভাবলাম, অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য চিন্তা করার সময় পাওয়া গেল। কিন্তু সেই কয়েক মিনিটের চিন্তার টানা-পোড়েনে বিব্রত হয়ে উঠলাম। কোহিমা যাচ্ছি একটা বিশেষ কাজে। হাতে সময় অল্প। হোটেলে উঠে তাড়াতাড়ি কাজ সারা যায়। কিন্তু মেয়েটি বিশেষভাবে অনুরোধ করছে ওর বাড়িতে অতিথি হবার জন্য। তদুপরি সংগিনী যেখানে ইংরাজী জানে। নাগা পাহাড় বলে নয়, সমস্ত পাহাড়ী এলাকায় ভাষা একটা মস্ত মূলধন। অন্তরংগ হবার একমাত্র উপায় ভাষা। আমি তো নাগা ভাষা জানি নে।

দেখতে দেখতে বাস এসে কোহিমার তোরণে থামল। লাল পাতাবাহারে রঙীন হয়ে আছে কোহিমার তোরণ। এই সেই কোহিমা, যেখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কত কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে। দূর থেকে দেখা যায়, পাহাড়ের গায়ে, নিচে এবং উপরে ইতস্তত ছড়ানো অথবা যূথবদ্ধ বাড়িগুলোর শার্সীতে ঝলমল করছে সূর্যালোক। চারদিকে পাহাড়। চূড়ায় চূড়ায় মেঘ। মটর স্ট্যাণ্ডে কমলালেবু নিয়ে বসেছে সারি সারি নাগা কিশোরী।

"নামুন, নেমে পড়ুন," এই বলে নার্সটি আমাকে ডাকতে লাগল।

আমি নামলাম বটে, কিন্তু তখনো দোটানায় আছি! হোটেলেই যাওয়া শ্রেয়। অথচ, মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে আছে জিজ্ঞাসু হয়ে।

"বেশ আপনার অতিথিই হব, চলুন যেখানে নিয়ে যাবেন।" এগিয়ে এসে মেয়েটিকে বললাম।

খুব খুশি হল সে। বললে, "আমার নাম ইরালু। এই নামেই আমাকে ডাকবেন।"

তারপর সংক্ষিপ্ত কাজ। নাগাপাহাড় সমতলবাসীর জন্য নিষিদ্ধ এলাকা বলে অনুমতিপত্রের ছোটখাট কাজ শেষ করে নেয়া হল।

আমরা রওনা হলাম। আমার মাল একটা মুটে তুলে নিল। কুমারী ইরালুর জিম্মায় আমি তখন। সুতরাং আমার কিছু করার ছিল না।

পাক্কা আড়াই ঘণ্টা হেঁটে, উচু-নিচু পাহাড় ভেঙে যখন আমি ইরালুর গাঁয়ে এসে পৌঁছলাম, তখন আমি ঘর্মাক্ত, পরিশ্রান্ত। ইরালু বলেছিল, শহর নয়, নাগাপাহাড়ের গ্রাম দেখাবে সে। শহর তো সর্বত্র একই ধরনের। কিন্তু গ্রাম, নাগাপাহাড়ের গ্রাম। এক দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল আমার, নাগাপাহাড়ের খানিকটা অন্দরমহল দেখব।

গাঁয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন অবাক হয়ে গেছি। একগোষ্ঠী মানুষের জন্য একত্রিত কতগুলো ঘর। ঘরের চালে আড়াআড়ি খড়্গ বসানো। খড়্গগুলি শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য। ইরালু বললে নাগাপাহাড়ে প্রতি পনের মাইলে এক এক রকম ভাষার ব্যবহার। সেই অনুসারে ভিন্ন ধরনের চালচলন। অংগামী, সেমা, লোটা, আও —নানান ধরনেব উপজাতি এক নাগাদের ভেতরই।

নৃতত্ত্বের দিক থেকে এই নাগারা এক আশ্চর্য জাতি। অথচ, মুশকিল এই যে, নাগাপাহাড়ের বেশি ভেতরে যাওয়া সম্ভব নয়। মোকোক্‌চাঙের এক শিক্ষাবিভাগীয় অফিসার আমাকে বলেছিলেন যে, মোকোক্‌চাঙ শহর থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলেই উলংগ মাথা-শিকারী নাগাদের সাক্ষাৎ মিলবে। কিন্তু নরমুণ্ডশিকারী নাগামুলুকে যাবে কে?

ইরালুর সংগে আমি যখন গাঁয়ে ঢুকছিলাম তখন ধান চাষের নমুনা লক্ষ্য করেছিলাম। পাহাড়ের ঢালু গায়ে থাক কেটে (terraced)

চাষবাস ভারী সুন্দর লেগেছিল। এ ধরনের চাষ মোংগোলীয়দের মধ্যে প্রচলিত বলে বইয়ে পড়েছি। ইরালুর কাছে শুনলাম, ওদের একটি গোষ্ঠী-গৃহও (communal house) আছে।

কিন্তু কুমারী ইরালু কোথায় আমাকে টেনে এনেছে? যতদূর তাকাও, চারিদিকে পাহাড়। এক নিস্তব্ধ নিঃসংগ পৃথিবীর মাঝখানে আমাকে টেনে এনেছে মেয়েটি। হাঁ, গ্রামই বটে। নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু দুঃসাহসিকা মনে হল ইরালুকে। বন্যেরা বনে সাহসী।

নাগাকন্যা ইরালু এবার খাঁটী নাগা ভাষায় যে চাৎকার পাঠাল, সে চীৎকারে ছোট্ট গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই বেরিয়ে পড়ল। চীৎকারের অর্থ ছিল সম্ভবত, "আমি এসেছি।"

কিন্তু ইরালুর আমি নয়, আমরাকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল গাঁয়ের সকল লোক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওরা আমার দিকে তাকাতে লাগল। সে দৃষ্টির চোখাচোখী হতে আমি পারছিলাম না।

ইরালু নাগা ভাষায় কি জানি সবাইকে বুঝিয়ে দিল। ওরা ইরালুর কথা শুনে ঘাড় নাড়ল। ওদের চোখের সন্দেহ কমে গিয়ে সেখানে খানিকটা বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হল।

আমাকে যেখানে নিয়ে গিয়ে একটা কাঠের তেপয়ের মত আসনে বসতে দিল, সেটা সম্ভবত গোষ্ঠী-গৃহ। ঐ ফাঁকা বারোয়ারী ঘরে আমাকে বসিয়ে ইরালু বললে— "তুমি ঘাবড়ে যেওনা বন্ধু, তুমি আমাদের অতিথি। আর আমি জোড়হাটে থেকে খৃস্টান হয়েছি। তুমি আমাদের যীশুর মত পূজ্য।"

শুনে হাসলাম। ইরালু আমাকে নিশ্চিন্তে বসে বিশ্রামের উপদেশ দিয়ে চলে গেল। সে চলে গেল, কিন্তু আমার কাছে কেউ এল না। এসেই বা লাভ? কেউ জানে না আমার ভাষা।

শুধু কাছাকাছি কয়েকটি উলংগ নাগা ছেলে-মেয়ে ঘুর ঘুর করতে লাগল। কয়েকটি গৃহপালিত শুয়োর এধারে-ওধারে ঘোরাঘুরি করে চলে গেল।

কখন যে, খানিকটা বিচালির উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, জানিনে। ইরালুর ডাকে ঘুম ভাঙল। দেখি, এক পেয়ালা চা নিয়ে এসেছে। বললে, "জোড়হাট থেকে কাপ নিয়ে এসেছি আমার জন্য। তাতেই তোমার জন্য চা করে দিয়েছি। চায়ের সরঞ্জাম সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। তুমি নিশ্চিন্তে চা পান কর।"

চায়ে চুমুক দিয়ে ভারী ভালো লাগল। ইরালু বললে—"একটু পরেই তোমার আগমন উপলক্ষ্যে এই ঘরে একটি ছোট্ট উৎসব হবে। আমি যা বলি, তুমি তাই করবে। তুমি আমাদেব গাঁয়ের সম্মানিত অতিথি।"

কোনো প্রশ্ন করতে পারলাম না ওকে। বিদ্যুতের মত সে চলে গেল। ভারী ব্যস্ত সে।

প্রায় বিকেল হয়ে আসছিল। অবাক লাগছিল আমার। কোথাও কোনো বাড়িতে উঠলাম না। এক বারোয়ারী ঘরে আমাকে ফেলে রাখা হয়েছে।

খোলা দরজা দিয়ে গাঁয়ের খানিকটা অংশ দেখা যায়। গাঁ ত নয়, এক ঝাড় ঘর। লেংটিপরা নাগা তরুণেরা ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাগা তরুণীরাও ব্যস্ত।

হাত-ঘড়িতে দেখলাম প্রায় ছ'টা বাজে। তাহলে ঘণ্টা আড়াই কিংবা তিন আমি ঘুমিয়েছি। শরীরটা বেশ একটু হালকা লাগছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল গ্রামটা ঘুরে দেখি। কিন্তু অপরিচিত পুরুষের পক্ষে গ্রাম ঘুরে দেখার কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না, তাত জানিনে।

আরো গেল প্রায় আধঘণ্টা। দেখলাম, ইরালু আসছে। পেছনে

পেছনে গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ সবাই যেন আসছে। ব্যাপার কি? পুরুষদের হাতে বড় বড় ন্যাকড়া-জড়ানো ডাণ্ডা। আর মেয়েদের হাতে পুঁটুলির মত।

দেখতে দেখতে বারোয়ারী ঘর প্রায় ভরে গেল। ঘরে রীতিমত উৎকট গন্ধ। ঘামের তো বটেই। কিন্তু এদের মধ্যে একটি মেয়ে যেন সেজে গুজে এসেছে। হাতে তার কয়েক প্যাকেট সস্তা দামের সিগারেট।

তারপর প্রায় ভোজবাজীর মত অবস্থা। এক বিরাট দর্শন নাগা এসে আমার ডানদিকে বসল। বাঁ দিকে বসল সেই সাজানো তরুণীটি। সম্ভবত সর্দার আর সর্দার-কন্যা।

ইরালু নাগা ভাষায় একটা উদ্বোধনী বক্তৃতা দিল। তারপর কিছু বক্তৃতা দিল সর্দার। শেষে সেই সাজানো তরুণীটি আমাকে মাটির ভাঁড়ে কিছু নাগা-বীয়ার পান করতে দিল। বীয়ার অর্থাৎ তাড়ি।

মদ আমি খাইনা। কিন্তু আজকার এই বিশেষ সভা আমার সম্মানার্থে। কাজেই অতিকষ্টে এক চুমুক মদ খেলাম। বাকীটুকু সেই সাজানো তরুণীটি পান করল।

তারপর গ্লাসে গ্লাসে চলল মদ্যপান। অবশ্য মাটির আর এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস। শেষে শূয়োরের মাংস ভোজন।

ইরালুকে বললাম, আমি মাংস খাইনে। ইরালু কী জানি চিন্তা করল। শেষে সবাইকে জানিয়ে দিল যে, অতিথি মাংস খাননা। খবরটা যেন সারা সভায় তড়িৎ সঞ্চার করল।

সস্তা দামের সিগারেট যখন সর্দার-কন্যা আমাকে বিলাতে বলল এবং ইরালু দোভাষিণী হিসেবে আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে, তখন আমি সবাইকে হাতে হাতে সিগারেট বিলিয়ে দিলাম। সকলের হাসি-হাসি মুখ, কাজেই আমাকেও হাসি-হাসি মুখ করতে হল।

বারোয়ারী সভায় এবার মশাল জ্বলে উঠেছে। সেই ডাণ্ডাগুলিই তবে মশাল ছিল। কালো, বাদামী এবং ফর্সা মুখগুলি ঘরের ভেতর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। যেদিকে তাকাই, দেখি সকলেই আমার দিকে চেয়ে। ইরালুর সংগে চোখাচোখী হল। সে হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু হেসেও মুখ ফিরিয়ে নিলনা কেবল আমার বাঁ-পাশের মেয়েটি, যে আজ আমার জন্যই বিশেষ করে সেজে এসেছে। অবিকল আমার দিকে সে তাকিয়ে আছে। তার চিবুকে তিল, বিস্ফারিত চোখ, গালের রঙ লালাভ। বছর কুড়ির বেশি বয়েস নয়।

সভা শেষ হল। খানিকটা হৈচৈ, খানিকটা করমর্দন। জনান্তিকে ইরালু বললে—"এবার চলো বন্ধু, আমাদের বাড়িতে চলো।"

বারোয়ারী ঘর থেকে বেরিয়ে ইরালুকে বললাম—"চলো, আধ ঘণ্টা খানেক তোমাদের গ্রাম ঘুরে আসি। তারপর তোমাদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকব।"

সে বলল—"কিন্তু রাতের বেলায় কিছু যে দেখতে পাবেনা। তার চাইতে চলো বেড়াবার জায়গা দেখিয়ে আনি।"

ইরালুর সংগে আমি চললাম। আকাশে কিছু তারা কিছু মেঘ। কিছু জ্যোৎস্না, কিছু অন্ধকার। হাঁটতে হাঁটতে যেখানে এসে পৌঁছলাম, সেটি হল একটি টিলার শেষ অংশ। তারপরেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে টিলা।

তুজনে একটু তফাতে বসলাম। টিলা ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে কোথায় গেল জানিনে। কিন্তু লক্ষ্য করছিলাম, একটা প্রদীপ জ্বলছে টিলার নিচে। আর সেখানে কেঁপে কেঁপে উঠছে জলের তরলতা। সম্ভবত, বাসন মাজতে বসেছে কেউ। কিংবা পা'ধুতে নেমেছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না অত দূর থেকে।

ইরালু বললে—"তোমাকে কষ্ট দিলাম বন্ধু। আমাদের খাওয়া তুমি খেতে পারলে না। অথচ তোমাকে আপ্যায়ন করব ভেবেই এনেছিলাম। কিন্তু শেষে বুঝলাম, তোমাদের আর আমাদের খাওয়াতে কত তফাৎ।"

ইরালুর দরদভরা কণ্ঠ। নার্সের পক্ষে দরদ স্বাভাবিক। ওরা দরদের চাষ করে।

ওকে বললাম—"তোমাকে তো এ-গাঁয়ের মেয়ে বলে মনে হয়না। তুমি তো আদব-কায়দায় অন্যরকম হয়ে গেছ।"

সে বললে—"সেটা মিশনারীর কল্যাণে।"

আস্তে আস্তে বললাম—"একটা কথা বলব ইরালু। জোড়হাটে তো অত নাগা নার্স আছে। কিন্তু ওদের কারুরই বিয়ে হয়েছে বলে মনে হয়না।

ইরালু বললে—"বিয়ে করলে চাকরি হাবাবার ভয় আছে। শুনেছি, তোমাদের ক'লকাতার টেলিফোন-গার্লরাও এই কারণে বেশির ভাগ কুমারী।"

—"এ খবর আমি জানি নে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আজীবনই বিয়ে করবে না?"

ইরালু হেসে বললে—"ভবিষ্যতের কথা জানিনে। তবে নাগা-পাহাড়ের একটা চিরাচরিত নিয়ম তোমাকে জানিয়ে দিই। সেটা হল আগে ভালোবাসা, তারপর পলায়ন, তারপর বিয়ে।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটল। তারপর ইরালু বললে—"চলো, বাড়িতে চলো এবার।"

ইরালুর বাড়িতে ফিরে এলাম। সারা গাঁয়ের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, প্রদীপ নিভিয়ে শোবার পালা। আর আলো এত অল্প যে চার পাঁচ হাত দূরের জিনিসও ভালো ঠাহর হয় না।

লেখাপড়ার বালাই নেই। শুধু খাওয়া, মদ্যপান আর ঘুম। এইতো ওদের জীবন।

ঘুমের ব্যবস্থা বারোয়ারী রকমের। একই ঘরে ঢালা কম্বলের উপর সকলের শয়ন। আমার নিচে একখানি লাল কম্বল পেতে দিয়ে ইরালু বললে—"সরকার যাদের পঞ্চায়েত বা সর্দার বলে বিশেষ খাতির করে তারাই লাল কম্বল পায়। আমার বাবাও লাল কম্বল পেয়েছেন।"

জিগ্‌গেস করলাম—"তোমাদের শয়নের ব্যবস্থা কি এই ধরনের বারোয়ারী ?

সে বললে—"অন্তত, আজকের রাতের জন্য এ বিশেষ ব্যবস্থা।"

দুটো কলা আর একটি কমলালেবু মিলল রাতের খাবার হিসেবে। তাই খেয়েই শুয়ে পড়তে হবে। ইরালু বললে—"সবাই এত মদ খেয়েছে যে, আজ আর রান্নাবান্না কারো ঘরে হবে না।"

শুয়ে পড়লাম। দেখলাম, আধাঅন্ধকারে কয়েকজন নাগা এসে পর পর শুয়ে পড়ল। কে শু'ল, কারা শু'ল, ঠিক বোঝার উপায় নেই। স্ত্রী, পুরুষ, কাদের সংখ্যা কত, বোঝা কঠিন। শুধু ইরালুকে দেখলাম, সে আমার পাশে শোবার ব্যবস্থা করেছে। শুয়ে পড়ার আগে ঘরের ভেতর অগ্নিকুণ্ডে কয়েকটি নতুন কাঠ ঠেলে দিল।

"ঘরে আগুন জ্বালানো থাকলে কোহিমার ঠাণ্ডা রাতকেও গরম মনে হয়। আর আগুন থাকলে শুধু অন্ধকারই কাটেনা, জানোয়ারের ভয়ও থাকে না। তাছাড়া ধূমপানেরও সুবিধে।" সে বললে।

ইরালু শুয়ে পড়ল। সম্ভবত সে ঘুমিয়ে গেল। কিন্তু আমার ঘুম আসে কই ? ঘুমটাই যেন ভয়ভয়। জেগে থাকাটাই জীবন। সমস্ত পরিবেশটা অস্বস্তিকর। কথা বন্ধ হলেই ভয় ঢুকতে চায় মনে।

এখান থেকে কতদূরে কোহিমা শহর, ঠিক জানিনে। যে-গাঁয়ে এসেছি, সে এক আশ্চর্য গাঁ। সমতলের লোকেরা এখানে আজো ঠিক ঢুকতে পারেনি। সেই ইংরেজ আমলের মত নাগাপাহাড় সুরক্ষিত এলাকা। যেন আসামের কাজিরাংগা বনের মত এটা মানুষ-পশুর জন্য রিজার্ভ-ফরেস্ট। আর এই নিষিদ্ধ এলাকার লোকগুলো সমতলের মানুষদের বেশি পছন্দও করেনা। তবু গত মহাযুদ্ধে এখানে ইংরাজ আর মার্কিন সৈন্য হুল্লোড় করে গেছে। ওরা এই অরণ্যে এনেছিল লণ্ডন ও ন্যুইয়র্কের সুর ও সুরা। গুলজার করে গেছে পাহাড়কে।

সেই ইংরাজ আর মার্কিন সৈন্যেরা চলে গেছে। কিন্তু যারা নাগাপাহাড়ে যুদ্ধ করতে এসে মরেছে, তারা ফিরে যেতে পারেনি গঙ্গা, টেম্‌স আর উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদীর তীরে তীরে। হতভাগ্য শাদা ও কালো চামড়ার দল। যারা যুদ্ধ করতে এসেছিল। আর ওদেরই স্মৃতিরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার কোহিমার তোরণে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করেছে কয়েকটি কথা। মণিপুরগামী ইংরাজী জানা যে-কোনো যাত্রী পড়তে পারবেন, লেখা আছে: When you go home, tell them of us and say for their tomorrow we gave our to-day. ঘরে যখন ফিরবে, তখন আমাদের কথা বলো—আমরা যারা তোমাদের আগামীকালের জন্য আমাদের আজকে উৎসর্গ করলাম।

ঘরের ভেতর রীতিমত নাসিকা-গর্জন শুরু হয়েছে। নাগাদের নাকের ছিদ্রও বড়। তাছাড়া, শারীরিক শক্তিও ওদের প্রচণ্ড। প্রকৃতি আর বন্য জানোয়ারের সংগে লড়াই করে করে এরা অসুরের মত শক্তি ধরে। অথচ, মজা এই যে, বন থেকে তুলে এদের ক'লকাতায় আনলে ওরা খুব শীগ্‌গিরই মরে যাবে। ক'লকাতায়

কংকাল-বাঙালীও রোগ ঘেঁটে ঘেঁটে যে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা, অর্থাৎ 'ইম্যুনিটি' অর্জন করেছে, সে ইম্যুনিটি তো ওদের নেই।

ইরাল্লু মিশনারী মেয়ে। মিশনারীর তৈরী ছাঁচ। নাগাপাহাড়ে বলে নয়, ভারতের বনে বনে, ময়ূরভঞ্জে, ঢেনকানলে, ফুলবানীতে অনুন্নত অধিবাসীদের মধ্যে নেমে মিশনারীরা কাজ করেছে। ওরা যে কিছুমাত্র ভালো কাজ করেনি, একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়। ওরা হাসপাতাল করেছে, স্কুল করেছে, রাস্তাঘাট সুগম করছে অরণ্যে। এদিক থেকে রামকৃষ্ণ মিশন অনেকটা ওদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তবে পলিটিক্স বাদ দিয়ে। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মটাও আজকাল যেতে বসেছে। রামকৃষ্ণের একশো আটবার নামের আগে তিনশোবার শ্রীযুক্ত করে হ্রীং ক্রীং ধ্যানের মন্ত্র জপতে জপতে জনসেবার আদর্শ ভুলে যাওয়া হয়েছে। এখন মিশন সর্বত্রই প্রায় কীর্তন ও ভজনের স্থান হয়ে উঠেছে।

ঘুম আর আসছিল না। নাগাপাহাড়ের গভীর অরণ্যে নাগাদের মধ্যে শুয়ে শুয়ে পরপর কত কথাই মনে আসতে লাগল। এংগেলসের ইরকয় জেন্স, গ্রীক জেন্স থেকে শুরু করে নাগাদের পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, ভারতের আদিবাসী-দেরই তো ধরে ধরে আসামের চা-বাগানে, কয়লার খনিতে, ত্রিবাংকুরের কফির বাগিচায় শোষণযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হঠাৎ আবার চিন্তাস্রোতে সাঙ্ঘাতিক বাধা পড়ল। ঘরে তখন নতুন কাঠগুলিতে আগুন জ্বলে উঠেছে। সমস্ত ঘরটা একটা লাল আভায় ভরে গেছে। সব জিনিস বেশ দেখা যাচ্ছে। সেই গনগনে আগুনের আভায় দেখলাম ঘরের ভেতর এককোণায় উপরের দিকে একসার নরমুণ্ড ঝুলানো। মুণ্ড ঠিক নয়, মাথার খুলি সমেত কংকাল।

দড়ি দিয়ে বাঁধা, মালার মত। আর তারই নিচে কয়েকখানি খড়্গ, যাকে বলে নাগা 'দা'।

অস্থির হয়ে উঠলাম। তড়িতের মত ভয় শিহরিত হল আমার মেরুদণ্ডে। আমি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলাম কি না, জানি নে। তবে ঘুম ভেঙে গেল ইরালুর।

সে আমার দৃষ্টির অনুসরণ করে ব্যাপারটা বুঝে নিল। সান্ত্বনার সুরে বলল,—"ও নরমুণ্ড একশো' বছর আগের। এখন এরা সভ্য হয়ে গেছে। এ আমাদের পিতৃ-পুরুষের সম্পত্তি। তুমি ভয় পেওনা বন্ধু। তুমি আমাদের অতিথি। তুমি আমার কাছে যীশুর মত পূজ্য।"

ইরালু উঠে বসেছে। গভীর মমতায় সে আমার হাত ঝাকানি দিয়ে বললে,—"আমাকে বিশ্বাস করো। তোমার কোনো ভয় নেই।"

ইরালুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে অকৃত্রিম মমতা। ঘরের ভেতর চেয়ে দেখলাম হাতকে বালিশের মত করে নাগারা শুয়ে শুয়ে আছে। পর পর বলিষ্ঠ দেহ পুরুষ। দু'তিনজন মেয়েও শুয়ে আছে। সম্ভবত একই পরিবারের লোক।

ভাবলাম, ভয় করে কি হবে? ইরালু যেখানে আছে। ওর বন্ধুত্বের সারল্য খাঁটি সোনার মত। আমি আজ তার কাছে যীশুর মত।

আমি যীশুর মত। যীশুর জীবনে প্রেমের স্থান ছিল না। কী আশ্চর্য, সে কথা মনেই ছিল না। ইরালুর আশ্বাসে আশ্বসিত হলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম তারপর যেমন করে আসে। সকালে উঠে বিদায় নিয়েছিলাম। বিদায় যেমন করে নিতে হয়, কিংবা দিতে হয়। ফিরে এসেছিলাম অক্ষত শরীরে কোহিমার তোরণে।

তারপর বাসে চেপে ইম্ফলে চলে এসেছিলাম।

চিত্রাংগদার দেশে

॥ দুই ॥

রাসনৃত্যের কেন্দ্র মণিপুর।

চিত্রাংগদার দেশ মণিপুর।

রম্য ইম্ফল শহর।

ম্যাক্‌স-ওয়েল বাজারে এক হোটেলের দোতলা থেকে দেখলাম রাস্তায় নানা সাজে নানান ধরনের নরনারী চলেছে। তার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। মণিপুর নারীপ্রধান দেশ।

কলারসিক বাঙালী কলকাতায় বসে মানসনয়নে যে-মণিপুরকে দেখেন, সেই মণিপুর অনেকাংশে উদয়শংকরের সৃষ্টি। মণিপুরী নাচের প্যাটার্ণ বা বিশেষ ঢংকে তিনিই সৌন্দর্য ও অনুভূতির হীরেমুক্তোর কাঠি দিয়ে ছুঁয়ে দিয়েছেন। মণিপুরের পাহাড়-ঘেরা নিভৃত অন্তঃপুর থেকে ঐ বিশেষ ঢংটিকে তিনি দেশে দেশে মুক্তি দিয়েছেন। মণিপুরীরা যখন নাচে তখন নাচটি যত সুন্দর, তার চাইতে ঢের সুন্দর যখন অমলাশংকর নাচেন।

কিন্তু মাফ্ করবেন, যদি বলি নাচের চাইতেও মণিপুরের বৈশিষ্ট্য বয়নশিল্পে। মেয়েরা যে-বেশভূষা করে, সে ওদের কুটিরেই তৈরী হয়। ওদের তৈরী সাজ-পোশাক চমৎকার। মোটকথা, এই গোটা জাতটার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। পাহাড়ের মাঝখানে একটা ছোট্ট চৌহদ্দির ভেতর, কলকারখানার আওতার বাইরে এই জাতটি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বেড়ে উঠেছে। নিজস্ব নাচ, নিজস্ব বয়নশিল্প, নিজস্ব সাজ-পোশাক, রীতিনীতি ও ভাষা।

তবে বাঙালীর কাছে ওরা ধার করেছে বৈষ্ণব ধর্ম এবং লিপিমালা। সম্ভবত বৈষ্ণব ধর্ম এবং লিপিমালাই ওদের আসামের অন্যান্য পাহাড়ীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করেছে। অন্যান্য পাহাড়ী শহর, যেমন শিলং বা কোহিমায় অবস্থা ভিন্নরূপ। সেখানে চলায় ফেরায় সাহেবীয়ানা এবং অক্ষরে রোমান লিপি।

কুয়াসা উঠে যাওয়ার পর ভারী মিষ্টি হয়েছে রোদ। পরিচয়পত্র নিয়ে উঠলাম গিয়ে দেবলা দেবীর বাড়িতে। দেবলা দেবী শিক্ষয়িত্রী, কিন্তু বিয়ে করেছেন দোকানদারকে। মণিপুরতনয়া, কিন্তু বিয়ে করেছেন এক বংগসন্তানকে।

কিছু বাংলা শিখেছেন তিনি। একবার নাকি শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ ট্রামে পারাপার হয়েছেন। গ্রাজুয়েট, ধনীকন্যা, বয়স তিরিশের মত।

পরিচয় হল, কিন্তু কী করে আলাপ জমাই। "অগত্যা শরণাপন্ন হলাম অগতির-গতি রবিঠাকুরের। জিগগেস করলাম ঃ "আপনি কি চিত্রাংগদা কবিতা পড়েছেন?"

দেবীর মৃদুহাস্য। "বললেন, আমাদের দেশের একটি মেয়েকে নিয়ে লেখা হয়েছে বলেই গভীর মনোযোগ এবং অনুভূতি মিশিয়ে পড়েছি।"

"অনুভূতি মিশিয়ে; অর্থাৎ?"

হেসে বললেন, "আপনাকে বেশি বোঝাতে পারব না।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আপনাকে একটা মজার কথা বলি, ইম্ফল শহর ত' ঘুরবেনই। পারলে মণিপুরের আশপাশ, একেবারে বিষেণপুর পর্যন্ত ঘুরে আসুন।"

"কেন অতদূর ঘুরতে যাব?"

জবাব দিলেন ঃ "দেখে আসবেন চিরযৌবনের দেশ মণিপুরকে।

জানেন, ষাট বছরেও এখানে সহজে কারো মাথায় চুল পাকেনা। কালোই থাকে কেশ। অথচ, তেমন যত্ন তো কেউই নেয়না।”

“হাঁ,” দেবী বলে চললেন, “ভাতকাপড়ের কষ্ট এখানে আগে তেমন ছিলনা, যতটা এখন হয়েছে। গত যুদ্ধটা গিয়েছে আমাদের মাথার ওপর। যুদ্ধটা আমাদের জাতকে সমতলের আরো কাছাকাছি নিয়ে গেছে।

“বর্মা থেকে পাঞ্জাবীরা এসেছে, ক’লকাতা থেকে আপনারা এসেছেন। সেই নিভৃতকুঞ্জ ইম্ফল এখন গঞ্জ হয়ে উঠেছে।

“এখন প্রসাধন ও পারিপাট্য বেড়ে গেছে আমাদের মেয়েদের। আমাদের ছেলেরা বেজায় সৌখীন হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য করবেন ইস্কুলে যাওয়ার সময় আমাদের মেয়েদের প্রসাধনপ্রিয়তা।

“আমাদের প্রাচীন পদ্ধতির জীবনযাত্রায় লেগেছে বারোয়ারী ছাপ। লোভ গেছে বেড়ে। বেড়েছে অভাব। খোলা দ্বার ইম্ফলের অন্তঃপুরে কেবলই অসন্তোষ বাড়ছে, যত আসছে বাণিজ্যের সম্ভার ভিন্ন রাজ্য থেকে।”

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম মণিপুর-নন্দিনীর কথা। আর আমার মনে ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছিল বহু নিভৃত দ্বীপ। ধনতন্ত্রী বণিক টোপ ফেলছে সমুদ্রে, পর্বতে। মরিশাস থেকে ফিলিপাইন, কর্কট-ক্রান্তি থেকে মকরক্রান্তিতে। বণিকবৃত্তি সভ্যতার ছদ্মবেশে লুণ্ঠন নয়ত’ কি?

দেবী চুপ করে আছেন। পীতবর্ণ, ঈষৎ ছোট চোখ, কপালে একটি তিল। ধনী চাষীর কন্যা। শিক্ষয়িত্রী না হলে অত তলিয়ে সব কিছু বিচারের ফুরসুৎ সম্ভবত হত না। কথা বলতে বলতে বেশ ভাবিত হয়ে গেছেন তিনি। কি ভাবছেন?

কী জানি, চাষীকন্যার কোনো জ্যোতির্ময় রূপ ভাবতে গেলেই

আমার ফরাসী কৃষকের দেশপ্রেমিকা মেয়ে জোয়ান অব আর্কের কথাই মনে হয়। ইনি নিতান্তই শিক্ষয়িত্রী।

নিস্তব্ধতার ভেতরে হঠাৎ দেবী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন, যৌবনের দেশকে একটু দেখিয়ে আনি। একটু বেড়াবেন, চলুন।"

রাস্তার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। আধা-চাঁদের মত ফর্সা পাগড়ি পরে যে লোকটা সাইকেলে যাচ্ছে, সে হয়ত' রাজবাড়ির গোমস্তা হবে। পর পর চার-পাঁচটি তরুণী সাইকেলে হনহন করে এগিয়ে গেল। হয়ত' নার্স, নয়ত' ছাত্রী হবে। বাপ্‌রে, কী সাইকেলের আনাগোনা এই ছোট্ট শহরে।

পথে যেতে চোখে পড়ল একটি সিনেমা-হাউসের গায়ে প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন। 'মিস-মণিপুর' নির্বাচিত করার জন্য ঘোষণা। দেবী বললেন, "দেখছেন, রূপের প্রতিযোগিতা হবে মণিপুরে। আমরা একেবারে ইয়াংকি হয়ে গেছি।"

হেসে বললাম, "চিরযৌবনের দেশ যে আপনাদের। হলই বা কিছু হৈচৈ।"

বিদ্রূপের ভংগীতে উত্তর দিলেন: "ছাই, এই ধরনের যৌবনের ঢক্কা-নিনাদ করার অর্থ হয়না। হাঁ গোটাদেশকে আনন্দে, সৌন্দর্যে, যৌবনে ভরে দাও, তবে বুঝলাম বিরাট কাণ্ড হয়েছে।"

গাছ যেখানে গাছের সংগে জড়াজড়ি করে পথকে নির্জন করেছে, সেখানে এসে দেবী গলার স্বর নিচু করে বললেন: "মণিপুরের আর এক ব্যক্তির নাম আপনি জানেন হয়ত।"

কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। জিগগেস করলাম: "কে তিনি?"

"ইরাবৎ সিং।" দেবীর স্বর খাদে নামল।

ঘাড় নেড়ে বললাম, "অনেক শুনেছি। তিনি ত' এখানকার আন্দোলনের নেতা ছিলেন। বম্বেতে বসে কাগজে কাগজে নাম

পড়েছি বহুবার। কোথায় তিনি ? তাছাড়া মুখোমুখীও বসে আমরা এককালে আলাপ করেছি শিলচরে।"

দেবী বললেন, "চাষীর মনের ভেতর। কত নাম ছিল তাঁর। কত জায়গা ঘুরতেন তিনি। আপনাদের রবিঠাকুর এক চিত্রাংগদার রূপ-যৌবনকামনাকে ফলাও করে দেখেছেন। কিন্তু তিনি স্বপ্ন দেখতেন, হাজার চিত্রাংগদার রূপযৌবনকামনা একদিন যদি সার্থক হয়।"

দুজনেই চুপ করে হাঁটছিলাম। হঠাৎ কানের কাছে শুনলাম দেবীর জোরালো আওয়াজ ঃ "শুনছেন, আমরা এসে পড়েছি।"

এবারে যা ঘটল, তা তেমনি বর্ণনাযোগ্য নয়। সাধাসিধে একটি বাড়ি। সেই বাড়িতে বাস করেন এক ভূতপূর্ব মন্ত্রী। মন্ত্রীর বয়েস ষাট বা তদূর্ধ্বে। মাথায় এক রাশ কালো চুল।

মণিপুরের মন্ত্রী। এককালের ছোট্ট করদরাজ্যের মন্ত্রণাদাতা। নিশ্চয়ই পাত্র-মিত্র সভাসদের খানিকটা ওপরে ছিল তাঁর সংস্থা। এখন তিনি ভূতপূর্ব, অর্থাৎ হৃতগৌরব। দরজা জানালার দিকে চেয়ে মনে হল, আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব।

দেবী নিজের কথা অত সংক্ষেপে শেষ করবেন, ভাবতে পারিনি। মন্ত্রীর দৃষ্টি আমার দিকে আকর্ষণ করে বললেন ঃ "এই ভদ্রলোক আপনাকে দেখতে এসেছেন।"

খানিকটা থতমত খেয়ে মন্ত্রী বললেন ঃ "বুঝতে পারছিনে কিছু।"

"বুড়ো হলেও যে চুল পাকেনি, তাই দেখতে এসেছেন।" হাসলেন দেবী দুষ্টামির হাসি।

এবারে আশ্বস্ত হতে হতে মন্ত্রী বললেন ঃ "তাই বলো, আমার চুল দেখতে এসেছেন। এ-রকম কালো চুল আরো অনেক দেখতে পাবেন গাঁয়ের দিকে।"

আমার দিকে একবার চেয়ে মন্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে দেবী বললেন ঃ "সেই কথাই একটু আগে ওঁকে বলছিলাম। মণিপুরের গাঁয়েগাঁয়ে চুলের যৌবন আট্‌কা পড়েছে।"

মন্ত্রী এবার হেসে উঠলেন হো হো করে। দেবীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ঃ "কিন্তু তোমার চুল শীগগির পেকে যাবে, এই আশীর্বাদ করছি। ভাল কথা, নাতজামাই আছে কেমন?"

"ভালোই।" তারপর আমার দিকে চেয়ে দেবী বললেন, ""অনন্তযৌবনা কেউ নয়; কিন্তু বুড়ো হলে চিত্রাংগদার মত অন্তত একরাত্রির জন্য রূপযৌবন ফিরে চাইব। সেইজন্যই গোড়ায় আপনাকে বলেছিলাম, অনুভূতিমিশিয়ে ঐ-কবিতাটি আমি মাঝে মাঝে পড়ে থাকি।"

দেবীকে ছেড়ে দিয়ে শহর দেখতে বেরোলাম, এক রিক্‌শা করে। সংগে এক বাঙালী বন্ধু। পথে অর্থাৎ ইম্ফলেই তাঁর সংগে পরিচয়। এবং আমার ধারণা, এই পরিচয় প্রথম এবং শেষ। ভবিষ্যতে চকিতে দেখা হলে হয়ত' নাও চিনতে পারি।

বন্ধুটিকে বললাম, "আমি মণিপুরের এক মন্ত্রী দেখে এসেছি। মন্ত্রীমশাই নিতান্ত গোবেচারী। তেমন বুদ্ধি, রুচি, অর্থ, জাঁকজমক, কিছুই নেই ওঁর। মণিপুরের মন্ত্রী, এর চাইতে আর কি ভালো হবেন।"

শুনে বন্ধুটি আমাকে সমর্থন করা দূরে থাকুক, উল্টে প্রতিবাদের কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ঃ "ভারতের কোন রাজ্যে ক'জন বুদ্ধিমান মন্ত্রী আছেন এই উনিশশো তিপান্ন সালে?"

বিব্রত হয়ে বললাম, "অন্তত এই মন্ত্রীর চাইতে সবাই নিশ্চয় বুদ্ধিমান।"

বন্ধু বললেন ঃ "আমি বিশ্বাস করিনে এ-কথা। সর্বত্র হবুচন্দ্র

গবুচন্দ্র। জাঁকজমক হয়ত' আছে, কিন্তু রুচি কই? আর মন্ত্রণা দেবার মত বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা কই? স্বাস্থ্যের যিনি মন্ত্রী, তিনি রোগ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক কোনো জ্ঞানই রাখেন না। বিদ্যার দপ্তরে যিনি বসে থাকেন, তিনি প্রায়ই অবিদ্বান। তবে হাঁ, অর্থের কথা বলছেন। মণিপুরে এই নিরীহ মন্ত্রী যা পাচার করতে পারেননি, গুজব যে, সেটাই আমাদের দেশের মন্ত্রণাদাতারা পেরে থাকেন।"

আমাদের হুকুমে রিক্‌শা চলেছে হনহন করে রাজভবনের দিকে। ক্যামেরা সংগে করে নিয়েছিলাম বটে, কিন্তু যখন রাজভবনে পৌঁছলাম, তখন সূর্য ঠিক ক্যামেরার সামনে। সুতরাং ফটো তোলা হল না। প্রাসাদ দেখে খানিকটা নিরাশও হলাম। এ যেন সাধারণ এক জমিদারের ভবন। পার্লাকিমেদী কিংবা ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রাসাদের ঐশ্বর্যও নেই।

যে আমাদের সারথ্য করছিল, সে আমার নৈরাশ্য বুঝল। রিকশায় ওঠবার মুখে আমার দিকে চেয়ে কৌতূহলের স্বরে জিগগেস করল: "বাবু বুঝি খুব নিরাশ হলেন?"

"তা সামান্য নিরাশ হলাম বৈকি।"

রিকশাওয়ালা তখনি তার অভিজ্ঞতার ঝুলি খুলে দিল। বলল, "ক'লকাতার সব বাবুই এই রাজবাড়ি দেখে নিরাশ হন। ওরা ভাবেন, এটা যেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মত কিছু হবে।"

"কই, তেমন কিছু একটা দেখতে পাব মনে করে তো আসিনি।"

রিকশাওয়ালা কথার সুর ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, "বিরক্ত হবেন না আমার কথায়। আমাদের মহারাজ গরীব বলেই সুন্দর প্রাসাদ গড়তে পারেননি।"

চুপ করে রইলাম, কোনো সাড়া দিলাম না ওর কথায়। বন্ধুটিকে জিগগেস করলাম: "কই, কোনো কথা বলছেন না যে?"

তিনি যেন স্বপ্নের রাজ্য পরিক্রমা করে এলেন। বললেন, "রাজায় আর রিকশাওয়ালায় এই গভীর দরদ আর কোথাও দেখেছেন ?"

"বারিপদায় দেখেছি। এক রিকশাওয়ালা তো সর্দার প্যাটেলকে গালিগালাজ করতে করতে ময়ূরভঞ্জের মহারাজার পুনর্বার গদি আরোহণের প্রার্থনা জানাচ্ছিল।"

বন্ধু বললেন: "সেদিনও কি আপনি এই ধরনের ঝক্ঝকে প্যাণ্ট-কোট পরে রিকশয় চেপে.ছিলেন ?

"হাঁ, তাই।"

"সেইজন্যেই। ঐ দামী প্যাণ্ট কোট দেখলেই রিকশাওয়ালা ভাবে আপনি মহারাজার রাজকীয়তার অনুরাগী।" বন্ধুর মৃদু হাসি।

হো হো করে এবার না হেসে পারলাম না। রিকশাওয়ালাও বোকা নয়। সে-ও ঠিক বুঝেছে হাসির ব্যাপার। হঠাৎ রিকশার বেগ কমাতে কমাতে বলল: "ডানদিকে ওটা হচ্ছে আসাম রাইফেলসের হাসপাতাল। কয়েকবছর আগে এখানে ভারী মজার ঘটনা ঘটেছিল।"

ডান দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলাম কেল্লার মত হাসপাতাল। তোরণে সশস্ত্র সান্ত্রী। উৎসুক হলাম রিকশাওয়ালার কাহিনী শোনার জন্য।

সে বলতে শুরু করলে: "কয়েক বছর আগে আমি এক সেপাইকে এখানে রিকশয় পৌঁছে দিয়েছিলাম। সেপাইটি ঘাড় গুঁজে সারাক্ষণ রিকশয় বসে ছিল। কোনো মতেই চোখ তুলে তাকায় না। যখন এই হাসপাতালের গেট পর্যন্ত নিয়ে এলাম, তখনো তাকায় না।

"গেটের সান্ত্রী ভাবল, হয়ত' মদ কিংবা তাড়ি খেয়েছে সেপাই।

সে তখন রাইফেল দিয়ে যেই খোঁচা দিয়েছে, অম্নি গেটের সান্ত্রীর দিকে ঘোর লাল চোখে একবার চেয়ে রিকশার সেপাই চীৎকার করে উঠল তারস্বরে ঃ "ইরাবৎ সিং, ছোড় দিজিয়ে।"

হৈ হৈ করে সবাই ছুটে এল, কোথায় ইরাবৎ, কোথায় ইরাবৎ, যাকে ধরতে পারলে বিশেষ সরকারী ইনাম মিলবে।

কিন্তু কোথায় ইরাবৎ ?

"এদিকে রিকশার সেপাই আবার ঘাড় গুঁজে বসে আছে। সে কোনোমতেই তাকাবে না। তাকালেই দেখবে চোখের সামনে ইরাবৎ। সামনে, পেছনে, উপরে, নিচে।

"বহুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে সেপাইকে রিকশা থেকে নামানোর পর ব্যাপার বোঝা গেল। সেপাইটি একা একা বিক্রম দেখিয়ে ধানের ক্ষেতে গিয়েছিল। ক্ষেতে তখন মণিপুরী কৃষাণীরা ধান তুলছে। সামনে ছিলেন চাষীর নেতা ইরাবৎ। মণিপুরী মেয়েরা সেপাইকে ধরে কিছু প্রহারেন ধনঞ্জয় দিয়েছিল। আর রাইফেলটি কেড়ে রেখে দিয়েছিল।

"হাঁ, মণিপুরী মেয়েরাই ওকে মেরেছিল।

"ভয়ে আতংকে সেপাইটির মতিভ্রম ঘটল। মতিভ্রম থেকে বুদ্ধিভ্রংশ। পরে সেপাইটি পাগল হয়ে গিয়েছে। এখনও রাজ-ভবনের কাছাকাছি মাঝে মাঝে দেখা যায় ইরাবতের উপস্থিতি কল্পনা করে তারস্বরে চীৎকার করে "ইরাবৎ"। আশ্রয় নেবার জন্য রাজ-প্রাসাদে ঢুকে পড়তে চায়। দারোয়ান তাড়িয়ে দিলে আকাশের দিকে চেয়ে চীৎকার করে ঃ "ইরাবৎ সিং, মুঝে ছোড় দিজিয়ে।" তারপরেই কোথায় চলে যায়। শুনেছি, কাইসম্পত জংশনের দিকে ওর কোনো আত্মীয় থাকেন।"

রিকশাওয়ালা কাহিনী শেষ করে পেছনে ঘাড় বাঁকিয়ে প্রথমে

আমার ভাবের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল। দেখল, সেখানে শুধু জিজ্ঞাসা। তাকালো বন্ধুর দিকে। দেখল, সেখানে কৌতূহল।

তখন বললে ঃ "মণিপুরে চাষীদের অনেক দুঃখ। গাঁয়ে গাঁয়ে গেলে তবে তো বুঝবেন। রাজা থাকেন সুখে।"

ইতিমধ্যে সবেগে রিকশা এসে সদর বাজারে ঢুকল। স্ত্রীলোকের বাজার। মণিপুরী পুরুষ বড় চোখেই দেখা যায়না। শুনেছি এককালে বাজারে পুরুষরা এলে প্রায় চরিত্রবিচ্যুতির অপরাধ ঘটত। অবস্থাটা বাংলা দেশের ঠিক বিপরীত।

মেয়েরা বেচছে ধুতি, চাদর, নানান সজ্জা। রাস্তার একদিকে মেয়েরা বেচতে বসেছে হাতের তৈরী জিনিস। রাস্তার অন্যদিকে শাকশব্জী, মাছ, আনাজ।

বিকেল। বাজারের কাছে হাসপাতালের ওপর তখনো রোদ আছে। পায়চারী করতে করতে দেখা হয়ে গেল দেবীর সংগে। একটিমাত্র তো বাজার। সুতরাং, এলে চোখ এড়াবার উপায় নেই। দেবীর সংগে একজন বাঙালী। দেবী পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, "ইনিই সদাগর স্বামী আমার।"

দোকানদার সওদাগর বৈকি। কিন্তু সদাগর নিজে যেন এই পরিচয়ে অস্বস্তি বোধ করছেন, সম্ভবত আমি বাঙালী বলেই। আমাদের পরিচয় করে দিয়েই হঠাৎ দেবী অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন ঃ "তোমরা আলাপ করো, আমি একটু ঘুরে আসব।"

এই বলে দেবী স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না-করেই ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন। দেবী চলে যাওয়ার খানিকবাদেই আমার সংগী বন্ধুটি হোটেলের দিকে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলেন।

অর্থাৎ, দুজনে দুদিকে চলে গেলেন অচিরে। রইলাম পৃথক জোড়ার দুই অবশিষ্ট। ভদ্রলোক বললেন, "কাছেই দোকান, চলুন বসবেন।"

সুন্দর একটি মনিহারী দোকান। হালফ্যাসানের টুকিটাকি জিনিসের সুরক্ষা। স্নো, গন্ধতেল, লজেন্স, খাতা, কত কিছু। তিনি বললেন ঃ "আসুন আমাদের দোকানের ভেতর।"

তাঁকে প্রশ্ন করলাম, "বাংলা দেশে কোথায় থাকতেন? কবে মণিপুর এসেছেন? কতদিন হল বিয়ে হয়েছে?" ইত্যাদি।

তিনি একএকটি করে সব জবাবই দিলেন। ভারী সুস্থির মানুষ।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিচয়ের শেষকৃত্য সারতে গিয়ে আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য অধ্যায়ে গিয়ে পৌঁছলাম।

শুধু বলেছিলাম, দেবলা দেবীর মত স্ত্রী অশেষ সৌভাগ্য না হলে হয়না। ভদ্রলোক যেন আকুল হলেন। বললেন, "ও কথা বাদ দিন।"

—"কেন, কেন?"

—"না, আমি সুখী নই বলে।"

—"কেন, দেবীকে তো খুব ভালো মনে হয়।"

"—আমি সুখী নই। আমি যে কি করব ভেবে পাচ্ছিনে।"

দেবীর স্বামী রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে কার আসা না-আসাব একবার পরখ করলেন। তারপর বললেন, "দেশে ফেরার পথ নেই। তুঃখের কথা কাউকে বলিনে। শুধু আপনি স্বজাতি বলেই বলছি। স্ত্রীতে স্বামীতে মিলছে না। দেখুন না, দোকান সামলাও, সংসার আগলাও, সব ঝামেলা আমার। তিনি কোন্ পার্টিতে, নেমন্তন্নে যে কখন চলে যান। স্বামীর পরোয়া নেই। জানিনে, কখন ফিরবেন আজ।"

চেয়ে দেখলাম স্বামীর চোখে বাঙালীর সনাতন প্রভুত্বের জলছবি। কিন্তু দেবী তা মানবে কেন? তাদের দেশ স্ত্রীপ্রধান। স্বদেশে দেবলা আছেন তুংগীতে স্বক্ষেত্রে। সুতরাং পরোয়া করার কথা নয়।

ভাগ্যিস দুজনে যখন চুপচাপ, তখন সন্তর্পণে ঘরে এসে ঢুকেছিলেন দেবলা। আমাকে বললেন: "আপনার কথা আমার স্বামীকে আগেই বলেছিলাম।"

স্বামী মাথা নেড়ে সায় দিলেন। দেবী স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "গোটা কয়েক টাকা চাই। টাকা নিতে ভুলে গেছলাম বলেই ফিরে এসেছি।"

ফুরসুৎ না দিয়ে দেবী নিজেই খুললেন টাকার বাক্স। দশ টাকার একটি নোট নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঝাঁ করে।

স্ত্রীর দূরত্ব একটু যখন প্রসারিত হয়েছে, তখন করুণ নৈঃশব্দ্যের ভেতর স্বামী বললেন, "দেখলেন তো মশাই, বলেছিলাম যে।"

না, ও তেমন কিছু নয়। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। ইম্ফল ছেড়ে যাব পরশু সকালের হু-হু করা বিমানে। ও তেমন কিছু নয়। দেবলাকে ভালোই লেগেছে। স্বামীই চরিত্রের দিক থেকে অযোগ্য। দুর্বল বাঙালীর এক ফেল্‌না সংস্করণ তেজস্বিনী চিত্রাংগদাকে বিয়ে করেছে। অর্জুন হয়ত' খোট্টা ছিলেন। কিন্তু গরমিলের শেষ কোথায়?

স্তূপীকৃত ও ছড়ানো চিন্তার এলোমেলো পাতার ওপর দিয়ে সাপের মতন অতি স্নিগ্ধ যখন নেমে এল ঘুম, তখন দেখলাম আমি সমতলে দাঁড়িয়ে। আর আকাশে ফেরারী চৌ এন লাই, চু তের মুখ না, ইরাবতের মুখ? সেই কবে যে 'এডগার স্নো'র "চীনের আকাশে লাল তারা" বইখানি অনুভূতি মিশিয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়ে রেখেছিলাম।

দস্যু ভূপতের চিরশত্রু, রবীনহুডের বন্ধু ইরাবৎ। কৃশদর্শন।

শিল্পীর মৃত্যু

॥ তিন ॥

এই মাত্র মৃত্যু হয়েছে।

শিলঙের এক স্যানাটোরিয়ামে এইমাত্র মৃত্যু হয়েছে ক'লকাতার এক বেহালা বাদকের।

রাত কত এখন? বোধ করি মাঝরাত। বাইরে জানুয়ারীর প্রচণ্ড শীতপ্রবাহ। সম্ভবত তুষার পড়ছে। এই দুঃসহ শীতে কী করে পথে বেরোই। একটা খবর দেয়া দরকার। কিন্তু কাকে খবর দেব? শিলঙে কে আছেন আত্মীয়?

মৃত-শিল্পী অবিকল যেন শুয়ে আছেন। পাশে ইতালীয় বেহালাটি। শিয়রে টেবিলের ওপর অসমাপ্ত একটি চিঠি। একখানি সামান্য কামরায় দিন-গুজরানোর কিছু সরঞ্জাম। স্যানাটোরিয়ামের কামরা।

সন্ধ্যের একটু পরেই এসেছিলাম দেখা করতে। ক'লকাতা থেকে এবার বেরোবার সময় শিল্পীর স্ত্রী আমাকে ঠিকানা দিয়েছিলেন। বাগবাজারে এক গলির ভেতর চল্লিশ নম্বর ভাড়াটে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে শিল্পীর প্রোষিত-ভর্তৃকা স্ত্রী বলেছিলেন, "শিলঙ যখন যাচ্ছেন, ওঁকে একটিবার দেখে আসবেন। আর বলবেন, জানুয়ারীর শেষ দিকেই যেন চলে আসেন। না-আসলে এদিক অচল হবে।"

"নিশ্চয় চলে আসবেন। আপনার শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগেই এসে পৌঁছাবেন।" মৃদুহাস্যে উৎসাহ দিয়ে শিল্পীর স্ত্রীকে সেই গলির মুখে ছেড়ে এসেছিলাম।

কিন্তু সেই যিনি বাগবাজারে জানুয়ারীর শেষে গিয়ে পৌঁছাবেন, তিনি প্রসন্নমনে আজ রাতে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন। আমার চোখের সামনে নিবে গেল তাঁর জীবনের আলোক। অথচ ভোরের এখনো দেরী আছে। এখনো আকাশে উজ্জ্বল হয়ে আছে স্বাতী, অরুন্ধতী।

পর্দা একটু সরিয়ে ধরলে, জানালার কাঁচের শার্সীর ভেতর দিয়ে দেখা যায় চাঁদকে—পৃথিবীর একটিমাত্র উপগ্রহকে। লোকায়ত জনপদের সকল মুগ্ধমানসের বৃন্ত থেকে লতিয়ে আকাশে ফোটা—ঐ চাঁদ।

আর? ঘরের ভেতর শিল্পীর শব। অহরহ দারিদ্র্যের জ্বালায় পুড়ে খাক হয়ে গেছে যে হৃদয়, সেই হৃৎ-সমুদ্রে ঐ চাঁদ আর আবেগের জোয়ার-ভাঁটা জাগাবে না। সকল উল্লাস পড়েছে ঘুমিয়ে। কল্যাণ ঠাটে চাঁদনী কেদার রাগে বেহালা বাজাবার।

সন্ধ্যের পর আমি এসেছিলাম। প্রথম চমকে গিয়েছিলাম স্বাস্থ্য দেখে। যখন বাগবাজারে সেই দেখেছিলাম, তখন ক্লান্ত ছিলনা চোখ। ভারী সুন্দর চোখ ছিল শিল্পীর। কচুপাতার ওপর শিশির-বিন্দুর মত। সে ছিল বাসরশয্যার পরদিন। যেদিন বসন্ত বাহার বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন। পূর্বী এবং কাফি ঠাটের সংমিশ্রণে।

সেই যে বাজিয়েছিলেন। আমিও এরপর কলকাতা ছেড়ে দেশে দেশে বেরিয়ে পড়লাম। আর যেতে পারিনি শিল্পীর সংসার দেখতে। না-জানি কত সাধের ছিল ঘরকন্না। অবশেষে এই দেখা স্যানাটোরিয়ামে। ভাবতেই পারিনি, এমন করে বিস্তারের মুখে জীবনের সুরের সবটুকু গুঞ্জন স্তব্ধ হবে। আর শিল্পীও কি সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাবতে পেরেছিলেন যে, আজই তাঁর জীবনের শেষ দিন হবে?

এই মুহূর্তে জানালা দিয়ে দেখছি রক্তিম আলোয় দীপ্ত মংগল। শীতের হিমজাল ভেদ করেও একটি উজ্জ্বল একক লাল চোখ

আকাশে। মংগলে এখন দিবালোক। দিবা কোলোরেডো নদীর পশ্চিমেও।

কেবল এখানে রাত। গভীর রাত। আমার পাঁচ ফিট দূরে শুয়ে আছেন—কলকাতার এক বেহালাবাদক। ওঁর বেহালার ছড়ে রক্তের বাসি দাগ। শিল্পীর মৃত্যু অনটনে, অনশনে। ক্ষয়রোগ উপলক্ষ্য মাত্র।

বাইরে কার জুতোর আওয়াজ ? আমার হৃৎস্পন্দনের তালে তালে মনে হল কে যেন দ্রুত হেঁটে আসছে রাস্তা দিয়ে। কানকে পেতে রাখলাম। কিন্তু শব্দ চলে গেল দূর থেকে দূরে। হয়ত' পুলিসের পাহারাকালীন পদধ্বনি। নয়ত' মনের ভ্রম।

কে জানে, শিল্পীর স্ত্রী বাগবাজারে এক এঁদো গলিতে চল্লিশ নম্বর ভাড়াটে বাড়ির একতলায় শুয়ে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছেন কিনা। কি দেখছেন ? হাতির শুঁড় ? সেই কপিলাবস্তুতে বুদ্ধের জন্মের আগে মহীয়সী নারী যেমনটি দেখেছিলেন। কিন্তু সেতো ছিল রাজপ্রাসাদ। খাস রাজার স্ত্রীর সুখস্বপ্ন।

দিনে চোখের উপর সূর্যের প্রখর টর্চ যতক্ষণ জ্বলে, ততক্ষণ গ্রহ-তারাময় এই আকাশই যে কেবল দেখি না, তা নয়। বোধ হয়, উদারতার কোনো ছোঁয়াই পাইনা। কিন্তু আজ রাতে, এই শিল্পীর মৃত্যুর তীরে বসে গুঁড়ি মেরে দেখছি, আকাশে কত তারা, কত জ্বালা, কত দহন, কত খাক-হয়ে-পুড়ে-যাওয়া সাক্ষীর দল। যে-রাতে চাঁদ নেই, সে-রাতে আকাশ জুড়ে অস্পষ্ট, অপ্রকাশিত সুদূর নীহারিকার ভিড়। ওরা কারা ? ওরা মেক্সিকো, কোস্টারিকা, গায়না—কত দ্বীপ বদ্বীপ জনপদের দুঃখী মানুষের চোখ। স্মরণাতীত কাল থেকে ওরা জ্বলছে। নিচতলার মানুষের বুকের জ্বালা নিয়ে।

আর আমি উৎকণ্ঠায় মুহূর্ত গুনছি এই ঘরে। সে কোন দেশ,

যেখানে তুষারে ফুল ফুটেছে, করুণায় দ্রব হয়েছে স্তেপভূমি। যেখানে এমন করে শিল্পী মরে না।

কিন্তু, কে আমি ?

এক সাংবাদিক। একদিন টেলিপ্রিণ্টারে আকুল হয়ে চীনযুদ্ধের খবর পড়তাম। মাঝরাতে খবর আসত মুক্তিফৌজ চীনের আর এক শহরের উপকণ্ঠে গিয়ে পৌঁছেচে। আমি তখন কল্পনায় সেই নগরের তোরণপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতাম উৎকণ্ঠায় বধূর মত। জানতাম না গাঁয়ের নাম, পথের দিশা। কিন্তু হৃদয় দিয়ে মুক্তিফৌজের সংগ নিতাম।

আমি সেই সাংবাদিক। কিন্তু শিলাতলে অপেক্ষমানা মহাশ্বেতার মত প্রিয়তমের পুনরুজ্জীবন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারিনি।

সাংবাদিক বৃত্তি আমাকে সাময়িকভাবে ছাড়তে হল। এমন একটা অবস্থা, যেখানে ছাড়া এবং ছাড়িয়ে দেয়া—তুটোই রইল সত্য হয়ে। উনিশশ' আটচল্লিশ সাল। আমি বেকার হলাম।

উত্তর কলকাতায় এক বাজারে সেই দৈনিক-পত্রের বিখ্যাত সম্পাদক মশায়ের সংগে দেখা। তিনি স্নেহপরবশ হয়ে বললেন—"ভুল করছেন। বিপ্লব রাতারাতি আসেনা। কাগজ ছেড়ে যাবেন না।"

তারপর যদিও ছ'বছর চলে গেছে তবু সেই কথাটুকু আমি ভুলিনি। বিপ্লব যে রাতারাতি আসেনি —এ-কথা আজ উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তবুও ভুল করেছিলাম কি-না, আজো তা ঠিক ঠিক মেনে নিতে পারছি না।

বেকার হওয়ার পর যা' হয়। এদেশে চিত্রকর হয় কেরানী, কবি হয় জুতোর ক্যানভাসার, গায়ক হয় দোকানের খাতা লিখিয়ে। বাঁচতে ত' হবে। জীবন-জীবিকায় যে-দেশে মিল নেই, সে-দেশের অনেকেই এ-নিয়ে মাথা ঘামায় না। আগাগোড়া অসংগতির দেশে সুকুমার

কলার যদিও-বা কিছু মূল্য আছে, কিন্তু কলাকারকের কোনো মূল্য নেই। রসবোধটা নিতান্ত ফালতু জিনিস।

এমন একটা তাসের দেশে আপাতত বেঁচে থাকবার জন্য যখন যাযাবর-বৃত্তি নিলাম, তখন বন্ধুরা অবাক হয়ে গেলেন। আমার চোখের সামনে কিন্তু তখন কেবল একটা মুখ। সে মুখ কড্‌ওয়েলের। লোকটি কয়েক বছর আমাদের লাইনে ঘুরেছিল। 'ইলিউশন এ্যাণ্ড রিয়্যালিটি'র লেখক কড্‌ওয়েল।

"বাবা ক্যানভ্যাসার এসেছেন।"

আমি চমকে ওঠেছিলাম। সতেরো বছরের একটি নিরীহ মেয়ে দরজা খুলে প্রথমে আমার দিকে করুণা-পরবশ হয়ে তাকালে। দেখলে, হাতে আমার ব্যাগ। চীৎকার করে দোতলায় খবরটি বাবার উদ্দেশে পাঠিয়ে দিল। বাবা ডাক্তার। ওপর থেকে সমান চীৎকার পাঠালেন ঃ "বল্, এখন দেখা হবে না"।

হাওড়ার বাজেশিবপুর রোডে তখন ভর-সন্ধ্যে। আলো জ্বালানো হয়েছে কিংবা, হয়নি। গলিপথে আলোর চাইতে বেশি অন্ধকার। হাঁ, আমি চমকে উঠেছিলাম। পায়ের নিচে শিবের অস্তিত্ব টের পেয়ে জিভ বের-করা কালীমূর্তির মত।

তখন মনে হয়েছিল সহস্র মানুষের কথা। রেলে, ময়দানে, স্কুলে দেখা সহস্র ক্যানভাসারের করুণ চোখ মুখ। কান্নার জলে ভিজিয়ে নরম এঁটেল মাটিতে-গড়া মুখগুলো।

আবার যখন মুখ তুলে সেই সতেরো বছরের মেয়ের দিকে তাকালাম, তখন চোখের সামনে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার সামনে অভিজ্ঞতার দরজা তখন থেকে খুলতে শুরু করেছে।

অভিজ্ঞতার সে যে কত বড় মহল। মহলে মহলে কত দরজা। বাদ্‌শাজাদীর রহস্যময় অন্তঃপুরের মত।

আমি বুঝেছি—সাধারণ মানুষ অভিজ্ঞতায় কত অসাধারণ। সবুজ আলো জ্বালিয়ে গাড়ীকে ক্লিয়ার যে দেয়, স্টেশনের সেই এক ঘরে বুড়ো রামদেও তিরিশ বছরে কত যাত্রি-যাত্রিণীর চোখের কাঁটা হয়ে রয়েছে। হাসপাতালের বুড়ী নার্স চল্লিশ বছরে বহু হাসি-কান্নার একটিমাত্র বিষুবরেখার ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছে। স্থবিরা পতিতাকে জিগগেস করলে জানা যায় যে, উষ্ণাংক শীতল করতে গিয়ে, সে কতবার আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে তাজ্জব হয়ে গেছে।

কত রাত এখন?

শিল্পীর ছোট্ট টেবিলের অসমাপ্ত চিঠি আর সমাপ্ত হবেনা কোনো দিন। স্ত্রীর কাছে এই অসমাপ্ত চিঠি পাঠিয়েই বা কি লাভ? পাঠানোর দায়িত্ব হয়ত' আমারই। বেহালাটাও পাঠিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু যে-দেহটা পেলে খুশি হতেন শিল্পীর স্ত্রী, সেটাই তো পাঠানো যাবে না। কাল পুড়ে যাবে সেই শরীর, যে শরীর বাগবাজারের এক গলিতে শিশুর জন্ম দেবে কয়েক-দিনের মধ্যে।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

চমকে উঠলাম আওয়াজে। দরজায় তিনবার আঘাত করল কে? অথচ, ঘরে আলো জ্বলছে বলে বাইরে কিছুই দেখা যায় না। দরজার কাঁচের ভেতর দিয়েও না।

"দরজা খুলুন তো।"

বাইরে ক্ষীণ মেয়েলী স্বর। কার স্বর? চেয়ারে বসে থেকেই যেন হিমে কাঠ হয়ে গেলাম। তবে কি শিল্পীর স্ত্রী রঞ্জা এসে

পৌঁছুলেন? এত রাতে ক'লকাতা থেকে? এই দারুণ প্রলয়ের রাতে? না, এ অসম্ভব। হতেই পারে না।

কিন্তু এলে তো বাঁচা যেত। এই মৃতদেহকে ওঁর জিম্মেয় দিয়ে দিতাম। এক নিমেষে আমি শীতের রাতেও ঘেমে উঠলাম। যেন আমারই মুক্তি হল।

"দরজা খুলুন।"

আর তো চেয়ারে বসে থাকা যায় না। অথচ, আবার ভয়ে অচল হয়ে যাচ্ছি। দরজা খুললে কি দেখব? কাকে দেখব সামনে? এই জনশূন্য বরফ-পড়া রাতে?

দরজা খুলে দিলাম। একটি মেয়ে বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢুকল। চেয়ে দেখি একটি খাসিয়া মেয়ে। বছর চব্বিশ-পঁচিশ বয়েস।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। শিল্পীর স্ত্রী রঞ্জা নয়। কিন্তু এ কে? ভয়ের রূপান্তর হল বিস্ময়ে।

"আমি স্যানাটোরিয়ামের চৌকিদারের স্ত্রী। চৌকিদার গেছেন আপার লাবানে। আজ রাতে ফিরবেন না। এত রাত অবধি ঘরে আলো জ্বলছে দেখে খবর নিতে এলাম। এ-রকম করে এই কোঠায় তো আর আলো জ্বলেনি এর আগে।"

আমি নিঃশব্দে শিল্পীর দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। চৌকিদারের স্ত্রী শিল্পীর দিকে খানিক চেয়ে বলল—"এ রকম করে কি লোকে ঘুমোয়? জ্বর হয়েছে বুঝি?"

চৌকিদারের স্ত্রী শিল্পীর শিয়র পর্যন্ত হেঁটে গেল। বেহালাটিকে টেবিলের ওপর তুলে আলগোছে রেখে দিল। তারপর শিল্পীকে না-ছুঁয়েই আমার দিকে চেয়ে জিগ্‌গেস করলে—"কবে থেকে জ্বর হল? কই, আজো তো বিকেলে বেহালা বাজিয়েছিলেন।"

কিছু জবাব দিলাম না। চৌকিদারের স্ত্রী যে এই-প্রবাসে শিল্পীর বেহালার একমাত্র অনুরাগিনী—একথা শিল্পী মরবার আগে প্রসংগত বলে গেছেন আমাকে।

ও আমার দিকে জবাবের প্রত্যাশায় চেয়ে আছে। চৌকিদারের স্ত্রী যেন আজকের রাতে মৃতশিল্পীর স্ত্রীর মত দরদের আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। কোথায় যেন পৃথিবীর সব স্ত্রীর মধ্যে মিল আছে বলে অনুভব করলাম। ওর চোখে মমতা। মুখখানি আমার চেনা-চেনা অথচ, আমার চেনা নয় ঠিকই। যেন কবে দেখেছিলাম। সেই পঁয়তাল্লিশ সালের উনিশে মে ওকে। নংক্রেম নাচের মেলায়। শিলঙ থেকে সাত মাইল দূরে স্মিথে। সেই খাইরিমের সিয়েম দেশের শস্য-সম্পদ কামনা করে প্রথম যেদিন দেবী 'কা ব্লেই সিন্‌শারের' কাছে ছাগল উৎসর্গ করলেন।

তার পরের দিন। নাচ-মণ্ডপের তোরণে শস্য-মঞ্জরী-আঁকা ছিল একটি নিশান।

সেই নিশানের লাল রঙের নিচে বুঝি চকিতে ঐ মুখ দেখেছিলাম। চারদিকে পাহাড়ের ঢেউ। মাঝখানে একটু সমতল। সেই নংক্রেমের মাঠ। একটি ফর্সা কচি মুখ। মেয়েটি কাঁদছিল।

কাছে গিয়ে জিগগেস করেছিলাম—"কেন কাঁদছ?"

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল—"সর্দারের বোনের মেয়েদের এক গা সোনার গয়না দেখে বলেছিলাম যে, আমি ওরকম সুন্দর গয়না না-হলে নাচব না।"

মা বলল, "রূপোর গয়না নিয়েই তোকে নাচতে হবে। সিয়েমের বোনের মেয়ে ওরা। তুই কি ওদের সমান? ওরা বড়লোক।"

আমি বলেছিলাম—"তবে তোমার সিয়েমকে বলে দিয়ো যে

আমি নাচতে পারব না। এই কথা বলায় মা আমাকে ভিড়ের মাঝখানে ঠাস করে মেরেছে।"

লালরঙের নিশানের নিচে সেই কাঁদকাঁদ মুখ তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। আমি সেদিন বিকেল পর্যন্ত ঐ মুখ খুঁজেছিলাম। কিন্তু দেখা পাইনি। পাহাড়ের ভেতর কোন গাঁয়ের ঐ মুখখানি, তাও তো জানা ছিল না।

আর এই এত রাতে সেই বাড়ন্ত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়েছে চৌকিদারের স্ত্রী। হারিয়ে গেছে তার কোমলতা, আছে কেবল আদল।

কিন্তু ঐ মুখখানি।

দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ছে, আর একবার যেন শিলঙে ঐ মুখ দেখেছিলাম। সে আরো কয়েক বছর পরে। কিশোরী তখন সম্পূর্ণ ফুটে উঠেছে।

ওর বিয়ে হচ্ছিল। ডিম ভেঙে মুর্গীর ভুঁড়ি দেখে শুভাশুভ বিচার করে বিয়ে। চারদিকে পাহাড়ী মেয়ে ছেলের ভিড়। হয়ত' বিয়ে হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু উৎসবটা ছিল বিয়ের। অনেক বনগোলাপ, ফার্ণ, ডালিয়া যোগাড় করা হয়েছিল।

আমি একটু উঁচু জায়গা থেকে উৎসব লক্ষ্য করছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে টের পেলাম বছর দশেকের একটি ছোট ছেলে কাঁদছে। ঠিক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

জিগগেস করলাম, "কি হয়েছে?" ছেলেটি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "দাদার জন্যে কাঁদছি। বিয়ের পর বৌদির সংসারে দাদা চলে যাবে। দাদা আমাকে খুব ভালোবাসত; কিন্তু বিয়ের পর দাদার শাশুড়ী দাদাকে কায়দা করে ফেলবে।"

বিয়ের ব্যবস্থার দিক থেকে বাংলাদেশ যদি দক্ষিণমেরু হয়, তবে খাসিয়ার দেশ উত্তর মেরু। অবিশ্যি, খাসিয়া এবং জয়ন্তীয়া পাহাড়ের

ভিন্ন ভিন্ন অংশে লিংগম, সিন্‌টেঙ, প্রভৃতি যারা বাস করে—তাদের সকলের বিয়ের পদ্ধতি এক নয়। আমি ভাবছিলাম, আমাদের পিতৃতান্ত্রিক দেশের কথা। বম্বের লালবাগ থেকে দাদার তক্ যে হাজার হাজার নোংরা আস্তানা আছে মজুরদের, সেখানে আখ আব কুল বেচে মারাঠী বধূরা। কাপড়ের কারখানায় কাজ শেষ করে সন্ধ্যের সময় বিশ্রামের কথা। কিন্তু শাশুড়ীরা বধূদের ঐ সময় পাঠায় রাস্তার ধারে।

এক বিকেলে কিছু কুল নিয়ে একটি মারাঠী বধূকে বলেছিলাম, "একটি পয়সা কম নাও।" শুনে সে বড় বড় চক্ষু করে বললে, "শাশুড়ী ওজন করে চার সের কুল বেচতে দিয়েছে। যদি হিসেব দেবার সময় একটি পয়সা কম পডে তবে শাশুড়ী রক্ষে রাখবে না।" এই বলে পিঠের কাপড় সরিয়ে দেখাল কালো কালো দাগ। কাল রাতে ছ'পয়সার হিসেব মেলেনি বলে শাশুড়ী মেরেছিল।

শতকরা নব্ব্‌ুইটি গাঁয়েরবধূর পক্ষে বাংলাদেশ যে জটিলা-কুটিলার দেশ। স্নেহপ্রবণ শাশুড়ী যেন ডুমুরের ফুল। সকল পিতৃতন্ত্রী দেশেই সমান অবস্থা। বিপ্লবেব আগে চীনের নদীগুলোতে বধূর চোখের জলে প্লাবন ডাকত। ঈশ্বর, রাষ্ট্র, পবিবার এবং স্বামী—এই চতুরংগ বাহিনীর দাপটে নির্জীব হয়ে থাকত তরুণী বধূ।

কিন্তু শিলঙে একেবারে অন্য অবস্থা। এটা হল মায়ের রাজ্য, স্ত্রী-তন্ত্রের দেশ। বিয়ের পর স্বামীই যাবে বধূগৃহে। সেই জন্যই কাঁদছিল ভাইটি। সেই দ্বিতীযবার দেখেছিলাম বধূবেশে মেয়েটিকে। কিন্তু কনের জড়তা ছিলনা কিছু। ছিল না রাঙা চেলী। ছিল হাসি খুশি মুখ। আপেলের মত লাল গাল। ছোট ছোট চোখ। শাশুড়ীর ঘরে যাবার আতংক নেই। বিয়ের পরেও সেই মায়ের ঘর, যে ঘরে এতকাল বড় হয়েছে।

"কথা বলছেন না কেন?"

বাঃ, বেশ পরিষ্কার বাংলা বলে মেয়েটি। জিগগেস করলাম, "এমন বাংলা শিখলেন কেমন করে?"

"স্যানাটোরিয়ামে বাঙালীরাই বেশি আসে। তাদের সুখ-সুবিধে বোঝবার তাগিদে।"

যে কথাটা মনের মধ্যে বার বার উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, তাই এবার জিগগেস করে ফেললাম, "আপনি কি নংক্রেম নাচে কোনোদিন আমাকে দেখেছিলেন?"

ভালো করে আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বললে—"কই, মনে তো পড়ছে না। নংক্রেম নাচ দেখতে অনেকবার গেছি, কিন্তু আপনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।"

"আপনি কি কোনো দিন নাচতেন?"

"না, কোনো দিনও না।"

এরপর আর কোনো প্রশ্ন করা চলে না। খানিক চুপ করে থেকে বললাম, "আমার এই শিল্পী বন্ধু কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেছেন।"

শুনে সে অস্থির হয়ে পড়ল। শিল্পীর কপালে হাত দিয়ে বললে, "ইস্ কী ঠাণ্ডা। কী সাংঘাতিক কথা। বেচারীর আর ক'লকাতায় ফেরা হল না।" এই বলেই চৌকিদারের স্ত্রী বললে—"আমি যাই। খবর দিইগে।"

হন্তদন্ত হয়ে চৌকিদারের স্ত্রী চলে গেল। আমি শূন্যঘরে পড়ে রইলাম। ভীষণ একা। রাত কখন ফুরোবে?

ক্ষয় রোগে মৃত্যু। এমন কত মরে ক্ষয় রোগে। সারাটা দেশ জুড়ে ক্ষয়। বাগবাজারে একটি ঘরে যখন সদ্যবিধবার কান্নার ধ্বনি উঠবে, তখন উজীরেআজম বলবেন, ও কিছু নয়। এই আমাদের

দেশ। অবস্থাটা ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুইয়ের শাসনকালের মতই অনেকটা। "After me the deluge".

কখন যে তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছিলাম। দেখছিলাম, মৃত্যুর পর খাসিয়াদের কল্পিত স্বর্গে শিল্পী প্রবেশ করেছেন। সেই নন্দনে শুধু সারি সারি সুপারি গাছ আর পানের সবুজ আভা। পান চিবোতে চিবোতে গভীর সুখে শিল্পী বেহালা বাজাচ্ছেন। আমি শুনছি তাঁর বাজনা।

দেখতে দেখতে আমার মুখ চৌকিদারের স্ত্রীর মুখের মত হয়ে গেল। সেই মুখ আবার শিল্পীর স্ত্রী রঞ্জার মুখে পরিণত হল। রঞ্জা কাঁদছেন। তাঁর কোলে ছেলে। সদ্য-ফোটা রডোডেনড্রনের মত লাল।

শুধালেম, "ছেলের কি নাম রেখেছেন ?"

"রাহুল," জবাব দিলেন শিল্পীর স্ত্রী, "বুদ্ধের ছেলের নামে নাম"। কিন্তু মুহূর্তে সমস্ত চুরমার হয়ে গেল। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। দেখি ঘরের ভেতর পুলিস ঢুকছে। একজন ইনস্পেক্টার, তুজন কনস্টেবল। পেছনে চৌকিদারের স্ত্রী।

"লাস জিম্মা নিতে এসেছে"- এগিয়ে এসে আমাকে বলল চৌকিদারের স্ত্রী। চেয়ে দেখি, চৌকিদারের স্ত্রীর ঠিক পেছনে বারান্দার নিচে গাঁদা গাছ। ফুলে ভোরের ফর্সা লেগেছে। তাহলে ভোর হয়ে গেছে। চৌকিদারের স্ত্রীর চোখে কি অশ্রু ?

"আমিই থানায় খবর দিয়েছি।" বললে চৌকিদারের স্ত্রী। তারপর সে চটপট জানলাগুলো খুলে দিতে লাগল। যেমন করে সে বরাবর জানলা খুলে দেয়। অভ্যাসের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

প্রবাসে আমার দ্বিতীয় এবং শেষ সুন্দর স্বপ্ন রোদের দাহে সেই যে পুড়ে গেল। কেবল পুড়ল না একটি মুখ। স্বপ্নের ভস্ম থেকে উঠে এসে জাতক রাহুল আমার মধ্যে প্রবেশ করল।

গোলকুণ্ডা দুর্গে

॥ চার ॥

তারপরেও পথ চলছি।

ময়ূরভঞ্জ থেকে ময়ূরাক্ষী নদী, রূপসা স্টেশন থেকে রূপসী নদী। আজকাল চক্ষু বুজে শুধু নাম শুনলেই বুঝে ফেলি, ওটা কোন রাজ্যেব জায়গা। ইচ্ছাপূরম, চিদাম্বরম, মায়াভরম, টিণ্ডিভানম—ওসব দক্ষিণ দেশের নাম। আবার ফারকাটিং, লামডিং, চাকিটিং, ওসব আসাম রাজ্যের নাম। জনপদের ছন্দ বাঁধা পড়েছে তার নামে, তার রাঙা মাটিতে, তার গম-যব-বাজরা-ভুট্টা-ধানের ক্ষেতে। মানুষের রঙে, মাপে, কথায়, কাকলিতে। তার ফরসা, তামাটে, কালো নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষায়।

কিন্তু সে কেমনতর আশা-আকাঙ্ক্ষা? চক্ষু বুজলেই দেখি পিল পিল করছে কোটি মানুষ। পিঁপড়ার মত ওরা খামারে, বন্দরে কাজ করছে। সে কি শুধু আজ থেকে? সেই বিগত যুগ থেকে ওদের পিতা-পিতামহরা পিলপিল্ করছে। ওদের কোনো ইতিহাস নেই, উত্থানপতনের কোনো নাটক নেই। উত্তর প্রদেশের শ্রাবস্তী বা কনৌজ, দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী কিংবা মাদুরায়, মধ্যভারতের উজ্জয়িনী বা বিদিশায় কোথাও ওদের পাত্তা নেই।

চোখের সামনে একটা ইতিহাস ভেসে ওঠে। সে ইতিহাস প্রাচীন ভারতবর্ষের। সে ইতিহাসের পাতায় আমার তোমার মতন লোকের সুখ দুঃখের সংবাদ নেই। আছে রাজন্যবর্গের উত্থানপতন,

দলাদলি, ষড়যন্ত্র, রাজ্যবিজয়ের কাহিনী। সে-সব কাহিনীর নায়ক হলেন চন্দ্রগুপ্ত, কণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত বা ঐ ধরনের কেউ। ওদের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার শিলালিপিতে রাজার কথা ছাড়া অন্য কথা লিখে যাননি।

ভারতে যখন একদিন এক বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্তের নামের মোহে কয়েক চন্দ্রগুপ্তের একই নামকরণ হয়ে চলেছিল, সেই সময় রাজ্য ভাঙা-গড়ার স্তূপের নিচে তখনো পিলপিল করছিল জনসাধারণ। হয়ত নন্দ-রাজার এক শূদ্রাণী দাসী মূরা তখন নিজের রূপ-যৌবন বিলিয়ে উঁচুতলায় উঠে এসেছিল।

আর আমাদের কবিরা? আজো যেমন ধনীর সেবা করেন, সেদিনও রাজার প্রশংসায় কলম চালিয়েছিলেন।

প্রমাণ, রাজা রামপালকে প্রশংসা করে কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনা 'রামচরিতম,' হর্ষবর্ধনের জয়গান করে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', সুলতান মামুদের আমলে ফেরদৌসীর 'শাহনামা' কাব্য, আলাউদ্দিনের প্রশংসায় আমীর খসরু। অবিশ্যি প্রশংসা না করেও উপায় ছিলনা, কেননা, তা না হলে রাজার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতেন তাঁরা। সেকালে রাজাই ছিলেন রাষ্ট্র।

সুনাম হলনা। শিল্পীরা অন্ধ হয়ে গেল আলো জ্বেলে কাজ করতে করতে। গড়ে উঠল তাজমহল। কিন্তু কৃতিত্ব শাহজাহানের। কোনারকের সূর্যমন্দিরের চূড়ায় উঠল অতবড় পাথর। সে কী সাঙ্ঘাতিক দক্ষতা। কিন্তু মন্দির-নির্মাণের খ্যাতি কেড়ে নিলেন অর্থদাতা রাজা। শিল্পীর কাহিনী কেবল কোনারকের নির্জন সমুদ্র-তীরে কিংবদন্তী হয়ে ঘুরতে লাগল। কিংবা হারিয়ে গেল ভগ্নস্তূপে। খ্যাতিমান হয়ে রইলেন কেবল শিল্পপতি।

সেই ভারত আর এই ভারত।

আমি চোখের সামনে আজকাল এই ভারতবর্ষকেই দেখি। বড়রা ছোটকে গিলে খায়। সবখানেই এই মাৎস্যন্যায়। অফিসের বড়বাবু থেকে ছোটবাবু। অফিসগুলো যেন এক একটা পুকুর। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র অফিসের যিনি সেক্রেটারী তিনি যেন রাঘব বোয়াল। সর্বত্র মালিক তো তিমি মাছ। বিরাট দেহ নিয়ে প্রচারের সমুদ্রে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠেন। তিনি যাবেন লণ্ডন-ন্যুইয়র্ক। কিন্তু সেক্রেটারী বা ম্যানেজারের দৌড় হিল্লী দিল্লী। সবখানেই গিলে খাওয়া আছে। সবখানেই মুঘল আমলের সেই ষড়যন্ত্র, যাকে বলে 'ক্লিক'।

আর নীরবে পিলপিল করে কেরানীরা। নীরবে পিলপিল করে কম্পোজিটর অথবা প্রুফরীডাররা। নীরবে পিলপিল করে পিয়ন চাপরাশীর দল। কেবল পিলপিল করে না দারোয়ান। গোঁফে তা দিয়ে বিহারী দারোয়ান ভাবে সে নন্দী-ভৃংগির চাইতে কম নয়। ভোজালী টেনে নেপালী দারোয়ান ভাবে, সে আছে বলেই মালিক আছে। মালিক তাকেই জিম্মা দিয়েছে পিলপিলদের। মালিকদের সংগে কত অন্তরংগতা তার জন্ম জন্মান্তরের।

অনেকটা 'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি।' মালিক ভাবেন, তিনিই অন্নদাতা। আর কর্মচারীরা ভাবেন, তাঁরাই অন্নদাতা। এর ভেতর দিয়েই ইতিহাসের রথ চলে।

সেই রথ চলে এসেছে। আগে অতটা ঝগড়া হত না, এখন হয়। একদিন গোপাল উদ্দণ্ডপুরে এবং ধর্মপাল বিক্রমশীলায়, অর্থাৎ পাটনা ও ভাগলপুর জেলায় বাঙালী পালরাজারা বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেছিলেন। একদিন হর্ষবর্ধনের আমলে মগধে, অর্থাৎ বিহারে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালী শীলভদ্র। পরে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান।

কিন্তু স্তম্ভ, স্তূপ, মঠ, চৈত্য ও বিহারের প্রাচীন জাতীয় পিতা বিহারী সম্রাট অশোকের প্রদেশবাসীরা আজকাল বাংলা টুসু গান সহ্য করতে পারে না। দেবে না বলছে মানভূম, পূর্ণিয়া ফিরিয়ে। এখানেও ঝগড়া। বিহারী আর বাঙালীতে সীমানার বাঁটোয়ারা নিয়ে।

মিনার, মসজিদ, সমাধি ও দুর্গের জাতীয় শিল্পপতি সাজাহানের আমলে পাকিস্তান ছিল না। আজ পাকিস্তান হয়ে বিবাদের শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পাক-মার্কিন চুক্তি ঘা মারতে চাইছে শান্তিকে।

মনে পড়েছে সিংজীকে। উনিশশ চুয়াল্লিশ সালের স্মৃতি। কী সুপুরুষ ঐ ভদ্রলোক। কী ঢল ঢল রঙ। প্রায় ছ'ফুট দীর্ঘ শরীর। জনতার ভিড়ে তাকে দেখাত জনস্পতির মত।

তিনি তখনো বিয়ে করেননি। মনে আছে, বিয়ের প্রশ্ন তোলায় তিনি বলেছিলেন যে, কর্ণাটক থেকে গান্ধার পর্যন্ত কোনো সুন্দরী মেয়ে তাঁর চোখে পড়েনি। তাঁর যোগ্য না হলে তিনি বিয়ে করবেন না।

ইতিহাসের অধ্যাপক সেই সিংজীর সংগে আমার দেখা এক কফিখানায়। নিজাম-হায়দ্রাবাদে এক কফিখানায় বসে নীরবে পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল ঐ সুন্দর লোকটাকে। অমন গড়ন, অমন দৃষ্টি, অমন বিহ্বলতা। এক কোণায় বসে তিনিও কফি পান করছিলেন।

তখন বাইরে রাজপথে সবে সন্ধ্যে মিলিয়েছে। বিমোহিত হয়ে উঠেছে চামেলী ফুলের গন্ধে সারা শহর। ফর্সা ঢিলে কামিজ পরে, চোখে সুর্মা মেখে, হাতে চামেলীর মালা জড়িয়ে গজল গেয়ে মুসলমান তরুণেরা রাস্তায় ঘুরতে শুরু করেছে। দোতলা, তেতলার

বারান্দায় ফর্সা মুখগুলো ঈদের চাঁদের মত দেখা দিয়েছে। সারা-দিনের অবরোধের পর ঘোমটা খুলতে পেরেছেন বিবিরা।

লক্ষ্য করলাম, ঐ সুন্দর ভদ্রলোকটি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। চার চক্ষুর মিলন। কফির দাম চুকিয়ে সরাসরি ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললাম: "আমি মুসাফির। আপনার চোখ এত সুন্দর ও বুদ্ধিময় যে আপনাকে এড়িয়ে যেতে পারলাম না। একটু আলাপ করতে চাই।"

তিনি হেসে বললেন: "আলাপ করুন।"

জিগগেস করলাম: "আপনি কোন দেশের লোক?"

"কোট্টায়মের।"

"সে কোথায়?"

"ভারতের দক্ষিণ দিকে।"

এরপরে আলাপ জমে উঠল। জানতে পারলাম, তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক। নিজের দেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ক্যাথলিক ব্যবসায়ীর শহর কোট্টায়ম। ত্রিবাংকুরের চারদিকে চা বাগান, কফি-বাগান আর রবারের বাগিচা। ইংরাজ প্লান্টারদের ঘাঁটি কোট্টায়ম।

সিংজী কয়েক বৎসর ধরে হায়দ্রাবাদে আছেন। খুব ভাল লেগেছে এই শহর। বিকেলে যখন সূর্যের আলোয় চারমিনারের সোনার চূড়া ঝলমল করে, তখন প্রায়ই তিনি নোনা ও আতাফলের জংগল পেরিয়ে, আম্বেরপেট ছাড়িয়ে এক পাথরের পাহাড়ে বসে থাকেন। সকালে, কলেজে আসতে লম্বা বাসের এক কোণায় নীরবে বসে থেকে মুশা নদী পেরিয়ে আসেন। নদীতে হেমন্তে যখন জল থাকে না, তখন নদী দিয়ে এক একা হেঁটে শহরতলীতে গিয়ে পৌঁছান।

শহরতলী অর্থাৎ গরীবের বস্তিতে। যেখানে মাটির সংগে লাগিয়ে তালপাতার ছাউনিদেয়া সারি সারি ঘর। হামাগুড়ি দিয়ে যে-ঘরে ঢুকতে হয়। যে-ঘরের আনাচে-কানাচে শীর্ণ দেহের ওপর বাসি ফুলের মত চোখের ফুল ফুটে থাকে। দক্ষিণীদের চোখ। নিমবনে ঐ চোখগুলো কেমন পিলপিল করে।

হায়দ্রাবাদের মক্কা-মসজিদের সোয়াশ' প্রদীপের ঝাড়ে ঝাড়ে আলোক জ্বালিয়ে দিলে যে-উচ্ছ্বাসেব সৃষ্টি হয়, সেই আকস্মিক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করলাম সিংজীর চোখে মুখে। অদ্ভুত লোকটা। যেমনি সুপুরুষ, তেমনি আবেগবস্ত।

কেন অকস্মাৎ এই উচ্ছ্বাস? তিনি যেন কী কল্পনা করছিলেন। বললেন না কিছু। তবু বুঝলাম তিনি একটা স্বপ্ন দেখছেন।

আমরা বিদায় নিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার হাত ধরে বললেন—"চলুন গোলকুণ্ডা ঘুরে আসি।"

আমি খুশি হয়ে বললাম—"বেশত। কবে যাব?"

—"কাল সকালেই। কাল রোববাব, ছুটির দিন। আর আমার কাছে দুজনেব জন্য ছাড়পত্রও আছে।"

পবদিন সকাল।

সিংজীর নির্দিষ্ট স্থানে এসে দেখি তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

তারপর একটানা বাস চলা। পথের দুধারে অজস্র আতাফল। ধুলি ও নুড়িময় চলা।

গোলকুণ্ডা দুর্গে অবশেষে পৌছলাম। সিংজীর কাছে ছাড়পত্র ছিল।

এক নিস্তব্ধ জনমানবহীন দুর্গ।

সিংজী বললেন—"বিশাল বাহমনী রাজ্য ভেঙে পাঁচটি ছোট রাজ্য হয়েছিল। এই গোলকুণ্ডায় ছিল কুতুবশাহী রাজ্য। এখানে সুলতানগণ রাজত্ব করে গেছেন। দুর্গকে কেন্দ্র করেই গোলকুণ্ডা শহর। এই গোলকুণ্ডার সংগেই বিখ্যাত কোহিনুর মণির কাহিনী জড়িত।"

নিস্তব্ধ বিরাট দুর্গের ভেতর দক্ষিণের হাওয়া আসছিল শোঁ শোঁ করে। দূরে সমতলে এক ছোট নদী রেখার ওপারে একটি প্রাচীন প্রাসাদ। আমরা এধার ওধার ঘুরছিলাম।

তখন জুনমাস। আকাশে বর্ষার মেঘ তখনো ঠিক পৌঁছয়নি। প্রায় চারশত বছর আগের তৈরী দুর্গ। সমতল থেকে আন্দাজ হাজার ফিট উঁচুতে দুর্গচূড়া। দুর্গ পুরোনো হলেও পাথরের মধ্য দিয়ে জল সরবরাহের কুতুবশাহী ব্যবস্থা তখনো অক্ষত ছিল।

দুর্গের এক জায়গায় একটা কারাগার। সিংজী বললেন, "এখানে এক রামদাসকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।"

শুধালেম—"শিবাজীর গুরু রামদাস নাকি?"

সিংজী বললেন—"রামদাস সম্পর্কে পরে বলব। আগে কারাগারটি দেখুন।"

চেয়ে দেখি পাথরের গহ্বর। কোটরের মত। যে ছিদ্রপথে হতভাগ্যের জন্য আহার্য নিক্ষিপ্ত হত, সেই ছিদ্রপথে অস্পষ্ট আলো আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম দেয়ালে রামসীতার মূর্তি। মাসের পর মাস রামসীতার মূর্তি এঁকেছেন বন্দী। চোখের জলে ভিজিয়ে।

দুর্গের পথটা এঁকে বেঁকে ওপরে গেছে। কামাখ্যা পাহাড়ের পথের সংগে সে-পথের মিল আছে। দুর্গটা একটি ছোট পাহাড়কে বেষ্টন করেই তৈরী হয়েছিল। আরো ঊর্ধ্বে একটি মন্দির। মন্দির

যেন দুর্গের মধ্যে এক প্রক্ষিপ্ত উপকরণ। বোধ করি কুতুবশাহী আমলের নয়। মন্দিরে সর্পদেবতার আল্‌পনা ও হনুমানজীর মুর্তি।

অবশেষে এলাম একেবারে শীর্ষদেশে। একেবারে পাহাড় চূড়ায়। শীর্ষে একটি শোভন প্রাসাদ। এটি নাকি সুলতানের ক্রীড়াভবন ছিল। দেয়ালে অতি সামান্য ভাস্কর্য। দিল্লী দুর্গের কাছে এ-দুর্গ নিতান্তই খেলো। লালকেল্লার কোনো ঐশ্বর্যই নেই এ দুর্গে।

কিন্তু তবু। ভারী ভালো লাগছিল এই দুর্গচূড়াকে। সমতল থেকে এত 'উঁচুতে। একটি জানলা টেনে খুলে দিতেই একদিকের দিগন্ত চোখের ওপর ভেসে উঠল। এখান থেকে রতনবাঈ লক্ষীবাঈ-এর প্রাসাদ চোখে পড়ে। সুলতানের বাঈজী ছিলেন ওরা।

কানের কাছে যেন বাজতে লাগল বহুকালের মৃত ঘুঙুর। ঘরের ভেতরে এক ঐশ্বর্যময় 'মহবুবকা মেহেদী মহল' এসে উপস্থিত হল। গজল গানের টুকরো টুকরো কলি। বোখারা থেকে আমদানী করা গোলাপজলের সুবাস।

সিংজী বললেন—"আসল জিনিস তো ওপরে। ওপরে চলুন।"

কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এলাম। ওপরে বিস্তৃত ছাদ। ছাদের মাঝখানে মঞ্চোপম উঁচু জায়গা। সেই উচু জায়গায় উঠে এলাম।

দেখি শ্বেতপাথরের একটি সিংহাসন। সিংহাসন কিংবা আসন কেবল।

দেখতে দেখতে আমার নেশা জড়িয়ে এল। ক্ষুধিত পাষাণের নেশা। আমি যেন সুলতান হয়ে গেলাম। নেমে এল পূর্ণিমা রাত। ওপরে আকাশ। আমি দুর্গের একেবারে চূড়ায়। আর ওপরে কিছু নেই। অসীম শূন্যে লগ্ন হয়েছে আমার আসন। বাঈজীরা নিচের বিস্তৃত ছাদে নাচতে শুরু করেছে।

সিংজী শুধালেন—"মতিমহলে যাবেন না ?"

মতিমহলে ? চোখের সামনে স্বপ্নের মত ভাসতে লাগল কুতুবশাহী আমলের মতিমহল। সাতটি সুন্দর প্রাসাদ। ভেতরে বাগান, বিলাসবেদী, কৃত্রিম ছোট সরোবর, বেগমদের চারু কার্যময় প্রকোষ্ঠ। সবই গোলকধাঁধা। আমিই তো কুতুবশাহী আমলের সুলতান। তৈরী করেছি মতিমহল। আমার নর্ম সহচরীদের কাছে নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু ততক্ষণে আরো রাত হোক।

সিংজী শুধালেন—"বাদশাহী কবরখানা দেখবেন না ?"

নেশা তখন কাটতে আরম্ভ করেছে। নর্মক্রীড়া থেকে কবরখানা। যৌবনের লীলাভূমি থেকে কবরখানা। কী শোচনীয় পরিণতি। নেশা কেটে গেল।

সিংজী বললেন—"এবারে রামদাসের গল্প শুরু করি। কবরখানা গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে গল্প শেষ হয়ে যাবে।"

তিনি গল্প আরম্ভ করলেন। আমরা ঘুরে ঘুরে পথ নামছিলাম, আর তিনি বলে চললেন—"রামদাস সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী আছে। তারই একটি আপনাকে বলছি।

"রামদাস ছিল জোয়ান পুরুষ। নর্মদার তীর থেকে চাকরির আশায় একদিন হাঁটতে হাঁটতে গোদাবরী পেরিয়ে গোলকুণ্ডা এসে উপস্থিত হল। সংগে ছিল তার নববিবাহিতা বধূ কমলাবাঈ। শিলীভূত, জলহীন, বৃক্ষহীন হায়দ্রাবাদের গ্রেনাইট পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে কমলাবাঈএর পা ফেটে ফেটে গিয়েছিল।

রামদাসের একটা চাকরি হল। কিন্তু মুশ্‌কিল বাধালো কমলাবাঈ। রামদাসের পদোন্নতি হল, কিন্তু মুশ্‌কিল বাধালো কমলাবাঈ। তার রূপে মুগ্ধ হলেন সুলতান।

কিন্তু বাঈ বেঁকে বসল। কিছুতেই সুলতানের কাছ ঘেঁসে না।

ধন দৌলতের লোভেও না। সুলতান মরীয়া হয়ে উঠলেন। কমলার সতীত্বটা কেবল বেয়াদপি।

একরাতে কমলাবাঈ স্বামীকে বলল—"চলো আমরা পালাই। যেখানে মানুষের ভয় নেই, সেই পঞ্চবটী বনে। কিংবা কোনো নিভৃত জনপদে।"

রামদাস বলল—"কিন্তু আমার যে ক্রমাগত মাইনে বাড়ছে। আমার যে সুলতানের দরবারে প্রতিপত্তি বাড়ছে। আমার যে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

কমলাবাঈ চুপ করে শুয়ে রইল। বুঝল যে, দৌলতের নেশা পেয়েছে স্বামীর। সেদিন আর কিছু সে বলল না।

কিন্তু অবস্থা একদিন হঠাৎ চরমে পৌঁছল। হনুমানজীর পূজার জন্য যখন কমলাবাঈ তোড়জোড় করছিল, তখন হঠাৎ সুলতান এসে দরজায় উপস্থিত।

সুলতান বললেন—"রামদাস, তোমার স্ত্রীকে আমার বেগমদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। তোমার আপত্তি আছে?"

"না, না, আপত্তি কিসের।" বলল রামদাস।

সুলতান খুশি হয়ে পঞ্চাশটি মোহর রামদাসের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। রামদাস মোহরগুলো কুড়িয়ে নিল। সুলতান কমলাবাঈকে নিয়ে চলে গেলেন।

কিছু পথ পর্যন্ত কমলাবাঈ গণ্ডগোল না করেই আসছিল। কিন্তু মাঝপথে বেঁকে বসল। বললে, "যাব না।"

সুলতান সেদিন উন্মত্ত। তিনি জোর করেই মতিমহলে কমলাবাঈকে নিয়ে গেলেন। এবং মতিমহলে ওকে বন্দিনী করে রাখলেন। মতিমহলের গোলকধাঁধা থেকে কমলাবাঈ বেরোবার পথ আর পেল না।

ওদিকে রামদাস তখন সুলতানের দরবারে আরো প্রতিপত্তির পথ খুঁজছে। কমলাবাঈকে মনে হল একটি সিঁড়ি মাত্র। সিঁড়ি সম্পর্কে সে আর উচ্চবাচ্য করল না। কমলা সিঁড়ি কিংবা সিঁড়ির একটি ধাপ কেবল।

মতিমহলে আরো যাঁরা বেগম হিসেবে ছিলেন, তাঁরা কিন্তু শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। কমলা তাঁদের চোখের কাঁটা। কমলাকে অপমান করার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন বেগমেরা।

অথচ, বাঈ নিজে কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দৌলতের লোভে? না, না। তবে?

এক আশ্চর্য নিরুত্তাপ। আসলে জীবনের ওপর স্পৃহা হারিয়েছে কমলা। স্বামীর কথা মনেও আনতে চায় না। ভুলে গেছে তার ছোট্ট গ্রাম। ফণীমনসার ঝাড়। বিয়ের স্মৃতি। নিজেকে সে ভাবতেই পারে না বেগম বলে। ভাবে বাঁদী। কী যে করবে, সে ভেবেই পায় না। আজকাল সুলতান এলেও আর বেঁকে বসেনা। হাঁ, না—কোনোটার মধ্যেই সে নেই।

সেদিন মহরম। অন্যান্য বেগমেরা সাজগোজ করে রাস্তায় বেরিয়ে গেছেন। মতিমহল নির্জন। কেবল দরজায় পাহারা আছে, কেবল চারদিকে অবরোধ আছে বিরাট দেযালের।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় নোনা গাছের নিচে বসে কমলাবাঈ। সহসা কানে এল আওয়াজ, "কম্‌লি, এ কম্‌লি!"

চাপা আওয়াজ। কিন্তু বোঝা গেল, দেয়ালের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে তার স্বামী রামদাস। অনেক কষ্টে দেয়ালে সামান্য ছিদ্র করে তারই রন্ধ্র পথে আওয়াজ পাঠাচ্ছে রামদাস।

"কম্‌লি, এ কম্‌লি, কমল।"

সোহাগভরা আওয়াজ। যে আওয়াজ এতদিন শিলীভূত গোল-কুণ্ডায় ছিল জলের স্নিগ্ধ ফোয়ারা।

তবু কমলাবাঈ জবাব দিলনা। অসীম ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। কিন্তু কিছুক্ষণ মুখ ফিরিয়ে বসতে না বসতেই আর্তনাদ করে উঠল। পিঠে তার তীর বিঁধেছে। তীর মেরেছে স্বামী ব্যাধের মত।

হৈ চৈ ব্যাপার। মহরম ছেড়ে ছুটে এলেন সুলতান। ওদিকে প্রহরীরা আটকে ফেলেছে রামদাসকে।

বিষাক্ত তীরে অচৈতন্য হয়ে পড়ল কমলা। ক্রমে তার শ্বাস কষ্ট হল।

সুলতানের হাত দুখানি ধরে মুমূর্ষু কমলা শুধু বললে—"আমার স্বামীর প্রাণদণ্ড দিওনা।"

অভাগী কমলা মরে গেল। সুখী হল মতিমহলের অন্যান্য বেগম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সুলতান। কেবল একটা লোকের কপাল ভাঙল।

সে লোকটা রামদাস। তাকে বন্দী করে রাখা হল। কমলাবাঈয়ের অনুরোধে প্রাণদণ্ড দেয়া হল না।"

গল্প শেষ করে সিংজী বললেন "ওটা একটা কিংবদন্তী। কেন যে, এই ধরনের কিংবদন্তী ছড়িয়েছে, বোঝা যায়না। তবে রামদাস অনবরত একটা যুগল মূর্তির ধ্যান করত, এটা ঠিক। নির্বাসিতা কমলাই ছিল ওর সীতা।"

আমি জিগগেস করলাম---"এটা কি শুধুই কিংবদন্তী?"

সিংজী হেসে বললেন—"গল্পটা রূপকও হতে পারে। মানসিংহের আমল থেকে বর্তমান যুদ্ধের আমল পর্যন্ত লোভনীয় চাকরি বা কনট্রাক্টের জন্য স্ত্রী বা বোনের এ-রকম অবস্থা কতই না হয়েছে।"

আমি চুপ করে রইলাম। কমলা বাঈয়ের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করছিলাম। এমন সময় সিংজী বললেন, "আমরা এসে পড়েছি। কবরখানা দেখুন।"

ঘুরে ঘুরে দেখি কবরখানাতেও ঐশ্বর্য। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গম্বুজ। স্নানের বেদী। যেখানে কবরে সমাহিত করার আগে শবকে সুগন্ধি অবলেপ মাখিয়ে দেয়া হত।

সিংজী বললেন—"লাবণ্যময়ী বেগমদের মৃতদেহ যখন সুবাসিত করা হত, তখন কাঁদত কেবল বাঁদীরাই।"

সিংজীর কথা পুরোপুরি কানে যায়নি। ভাবছিলাম কমলাবাঈয়ের কথা। তার জন্য কেউ কাঁদেনি। স্বামী, সুলতান, অন্যান্য বেগম —কেউনা। কেবল মতিমহলের কোনো তরুণ প্রহরী হয়ত' কয়েকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছি আমিও। যে-আমি কমলার মতই পিলপিলদের একজন।

নীরবে আবার আমরা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে অন্ধকার-সিঁড়ি বেয়ে গম্বুজের শীর্ষে উঠলাম। সব চাইতে বড় সমাধিটি যেন তাজের খানিকটা নকল। এখান থেকে দেখা যায় গোলকুণ্ডা দুর্গের চূড়াকে। যেমন করে তাজ থেকে দেখা যায় আগ্রা দুর্গকে।

এমন সময় সিংজী শুধালেন--"একটা কথা বলুনত, দোষী কে? রামদাস, না সুলতান, না কমলা, না বেগমেরা?"

আমাকে উত্তর দিতে না দিয়েই সিংজী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"ভারতে এখনো বহু রাজা, নবাব, মহারাজা, জমিদার ও ধনী আছেন, যাঁদের হারেমে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি। সমস্ত দোষটাই হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থার। অর্থবণ্টন বৈষম্যের।"

সেই সিংজীর কথাই আজ মনে পড়ছে। লোক হিসেবে তিনি ছিলেন প্রগ্রেসিভ। ভয়ানক আদর্শবাদী। প্রচুর পড়াশোনা করতেন। তাঁকে যখন হায়দ্রাবাদে দেখি, তখনো কাশিম রাজভীর দৌরাত্ম্য তত বৃদ্ধি পায়নি। তবে হায়দ্রাবাদের পুলিসশাসন তখনো ছিল কড়া। উনিশশ' চুয়াল্লিশ সাল।

পরবর্তী কালে ত্রিবাংকুর-কোচিনের নির্বাচনী মহড়ায় অথবা পলিটিক্সে তিনি কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা জানবার জন্য প্রায়ই ঔৎসুক্য জাগে। কেননা, এরপর তো আর দেখা হয়নি। দুটি বড় চোখে তাঁর স্বপ্ন ছিল অগাধ। চিরকুমার না থাকলে কাজ করা হয়ে ওঠেনা, এই ছিল তাঁর আইডিয়া। সেই সিংজী। সিংজী তাঁর ছদ্মনাম।

শান্তির জন্য

॥ পাঁচ ॥

আমি ভুবনেশ্বরের লাল মাটি।

প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে আমি উড়িয্যার ইতিহাস রচনা করেছি। আমার এখনকার লিংগরাজ মন্দিরকে কেন্দ্র করে সাত মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে যদি এক বৃত্ত রচনা কর, তবে দেখবে জনপদে জনপদে আমি আবার জীয়ন্ত হয়ে উঠছি। তোমার কল্পনা দিয়ে আমাকে দেখো।

আমার এক বড় রাস্তার পাশে ধৌলিতে সম্রাট অশোক যেদিন পাহাড় খুদে হাতী বানিয়ে দিলেন, সেদিন জনপদের চাষীরা দূর দূরান্ত থেকে অশোকের অনুশাসন পড়তে এসেছিল। কলিংগ যুদ্ধ যদিও চার বছর আগে শেষ হয়েছিল, তবুও গাঁয়ের লোকের অশ্রুপাতের বিরাম ছিলনা। যুদ্ধে একলক্ষ লোকের মৃত্যুই শুধু হয়নি। দেড়লক্ষ লোককে বন্দী করে নেয়া হয়েছে, এবং কত লোকই না নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। জনপদ শ্মশানের মত। যারা বেঁচে আছে, তাদের ঘরে ঘরে চলছে অনশন। পর পর অজন্মার বছরগুলিতে ঘরের চালে চালে শকুন বসেছে।

দুরু দুরু বুকে, চোখের জল মুছতে মুছতে চাষীরা এসেছিল। বড় রাস্তার ধারে পাথরে-খোদাই, অশোকের নোটিশ বোর্ড টাঙানো। "যুদ্ধ কী সাংঘাতিক, কী সর্বনেশে," তাই বলাবলি করতে করতে ওরা অনুশাসন পড়ছিল।

এখনকার ভুবনেশ্বর থেকে মাত্র একমাইল দূরে শিশুপালগড়ে থাকতেন অশোকের গভর্ণর। সেই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ মাটির নিচে নিচে আছে। সম্ভবত সেদিন ঐ নগরের নাম ছিল তোসালি। লম্বা আর চওড়ায় প্রায় পৌণে একমাইল ছিল নগর। পাশ দিয়ে বইত কৃশা নদী। নাম গন্ধবতী, যার এখনকার নাম গাংগুয়া। অশোকের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার আগে থেকেই তোসালি নগরের অস্তিত্ব ছিল। সেই খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে। হালে নেহেরুসরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগ শিশুপালগড়ের মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা সম্ভবত আবিষ্কার করেছেন সেই প্রাচীন তোসালিকে।

এবারে এসো, উদয়গিরি আর খণ্ডগিরিতে। উদয়গিরিকে তখন বলা হত কুমারী পর্বত। ছোট পাহাড়গুলোকে মৌচাকের মত করে বানিয়েছিলেন জৈন সন্ন্যাসীরা। গুহার পর গুহা। পাহাড় কেটে তৈরী হয়েছিল হাতীগুম্ফা, গণেশগুম্ফা, রানী গুম্ফা, অনন্ত গুম্ফা, নবমুনি গুম্ফা, আরো কত। ভারতের অন্যদিকে যখন সাঁচী স্তূপ, ভারহুত স্তূপ তৈরী হচ্ছিল, তার কিছু আগে বা পরে, উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতেও শিল্পীরা ঠকাঠক পাথুরে-পাহাড় কাটছিলেন।

হাতিগুম্ফার অনুশাসন পড়তে পড়তে মনে হয়, অশোকের কলিংগ-বিজয় কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। এক নন্দরাজা উদয়গিরি-খণ্ডগিরি থেকে এক জিন-মূর্তি চুরি করে মগধে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর কলিংগের জৈনরা এমন একটা কিছু করেছিল, যার জন্য মগধের সিংহাসন অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাই কলিংগের জৈন-শাসনের বিরুদ্ধে অশোক সেই বিরাট অভিযান করেছিলেন। কলিংগ-বিজয় প্রতিহিংসামূলক। স্বাধীন জৈন-কলিংগকে পদানত করা। কিন্তু তার একশ' বা দুশ' বছর পরে কলিংগ থেকে রাজা

খারবেল মগধের সিংহাসনের বিরুদ্ধে পাল্‌টা প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। যুদ্ধান্তে ফিরিয়ে এনেছিলেন সেই অপহৃত জিন-মূর্তিকে। আবার জয় হয়েছিল জৈনদের। অশোক তখন আর বেঁচে নেই। আবার নতুন নতুন করে গুম্ফা তৈরী শুরু হয়েছিল উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে।

খৃষ্টের তখনো জন্ম হয়নি। খৃষ্টের জন্মের আগে উড়িষ্যার ঐ চার শো বছরের ইতিহাস আমিই ধারণ করেছি। খারবেলের মৃত্যুর পর থেকে তারপর কয়েক শ' বছর আমি কেবল লাল মাটি আর জংগল হয়ে পড়ে রইলাম। অষ্টম শতাব্দীতে আমার মাটিতে গড়ে উঠল আবার পরশুরামেশ্বর মন্দির। কলিংগের শিল্পীরা সেদিন ঐ মন্দিরের দেয়ালে 'শিবের বিয়ের উৎসব' খোদাই করল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অভ্যুত্থান ঘোষণা করল ঐ মন্দির।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর বৌদ্ধধর্মে একটা লড়াই চলছিল আমার মাটিতে। শিশিরেশ্বর মন্দিরে ঢুকলে দেখবে ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্যের মধ্যে বৌদ্ধ ভাস্কর্য ঢুকে আছে। ঐ মন্দিরে নেপালী বৌদ্ধদের পঞ্চম ধ্যানী বুদ্ধের মত অমোঘ সিদ্ধির মূর্তি আছে। নালন্দার মাটি খুঁড়ে ঠিক এই ধরনের একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। নালন্দার ঐ মূতিব নাম দেয়া হয়েছে নাগার্জুন। যার মাথার উপর ছত্রাকারে সাতটি সাপ ফণা ধরে আছে।

খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতক।

রাজা খারবেল ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কলিংগ থেকে মগধের সিংহাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযান নিয়ে যাবেন। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়েছে। নতুন নতুন অস্ত্র তৈরী হচ্ছে।

রাজার অনুচরেরা গন্ধবতীর তীর থেকে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ধরে

নিয়ে এল। রাজা তখন জৈন সন্ন্যাসীদের কাছে উপদেশ শুনছিলেন। তাঁর কাছেই বসে রয়েছিলেন রানী। সন্ন্যাসীকে এক ঝলক দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি রানী আড়ালে গেলেন।

রাজা অনুচরদের জিজ্ঞেস করলেন—"কে ইনি ?"

অনুচরেরা বলল—"এক গুপ্ত বৌদ্ধসংঘের পরিচালক। আপনার যুদ্ধের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ইনি জনপদের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলছিলেন।"

রাজা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করলেন "এ কথা কি সত্য ?"

—"কোন কথা ?" সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী আবার পাল্টে প্রশ্ন করলেন।

—"আপনি আমার যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিরুদ্ধে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন ?"

সন্ন্যাসী বললেন—"আমি বৌদ্ধ। শান্তি ও মংগল চিরকাল আমার অভীষ্ট। আমি জনপদবাসীকে যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা বলছিলাম। আপনি এক জিন মূর্তিকে ফিরিয়ে আনবার জন্য শত শত যোদ্ধার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন, এতো আমি চাইতেই পারি না। আমি শান্তির স্বপক্ষে।"

—"আপনি বৌদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু আপনি কি কলিংগের সন্তান নন ?" প্রশ্ন করলেন খারবেল।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর চোখে আলো ফুটে উঠল এতক্ষণে। তিনি বললেন—"আমি কলিংগের সন্তান বলেইত' এই যুদ্ধের আরো বেশি বিরোধী। এদেশের জনপদের মানুষের সংগে আমার সম্পর্ক বড় মধুর। প্রতিদিন ওদের সংগে আমি মিশি। ওদের কাছ থেকে ভিক্ষে নিই।"

রাজা বললেন—"মগধের নন্দরাজা জিন-মূর্তি চুরি করে

নিয়ে যে কলিংগের অপমান করেছিল, এটা কি আপনি স্বীকার করেন না ?”

সন্ন্যাসী বললেন—“আমার ধর্মে নিন্দাবাদ, দোষারূপ, বিবাদ, ক্রোধ, অবিনয়—সমস্তই নিষিদ্ধ। গত পূর্ণিমায় আমাদের সংঘে সূত্রবিভংগ পড়ার পর ভিক্ষু-ভিক্ষুনীরা মিলে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমাদের মতে আপনার যুদ্ধ-প্রস্তুতি দেশকে অশান্তি ও অকল্যাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।”

রাজা খারবেল এ কথা শুনে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললেন —“আপনি ভিক্ষু। আপনি যদি রাজা হতেন, তবে ঐ কথা বলতেন না। যাই হক, আপনাকে এবার ক্ষমা করব, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আপনি আমার যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিরুদ্ধে কোথাও উপদেশ বর্ষণ করেন, তবে আর ক্ষমা করব না।”

অনুচরেরা সন্ন্যাসীকে ছেড়ে দিল। ছাড়া পেয়ে সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে রাজার সমুখ থেকে বেরিয়ে এলেন। নতমুখ হয়েই তিনি চলছিলেন। ক্রমে রাজপথ ছেড়ে বনপথে পড়লেন। সন্ধ্যে প্রায় হয়ে আসছিল। নির্জন পথ।

সন্ন্যাসী পেছন ফিরে দেখলেন, দূরে একটি লোক তাঁকে অনুসরণ করছে। দূরত্বের জন্য ঐ লোকটার চেহারা ঠিক ঠিক চিনবারও উপায় ছিল না। আশ্চর্য, লোকটা তাঁর দিকেই জোরে ছুটে আসছে।

সন্ন্যাসী সামনের দিকে জোরে পা চালাতে লাগলেন। অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন: “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।”

লোকটা ছুটতে ছুটতে আসছিল দেখে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যেন খানিকটা ভয় পেলেন। তাহলে আবার ধরে নিয়ে যাবে নাকি ? কিন্তু ধরতে হলে তো দলবল নিয়ে আসা উচিত ছিল। মুহূর্তে কী

যেন চিন্তা করে সন্ন্যাসী বনপথের পাশে একটি প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে বসে পড়লেন।

লোকটা সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করেই ছুটছিল। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ খেয়াল করল, সন্ন্যাসী মিলিয়ে গেছেন। সামনে পথও যেন আর নেই। এমনিতেই বনপথ, তায় আবার সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। মনে মনে হেসে উঠল আগন্তুক। সন্ন্যাসী তাহলে কি ভয় পেয়ে লুকিয়ে গেলেন ?

আগন্তুক. চারদিক চেয়ে নল। দেখল, কোথাও কেউ নেই। তারপর জোরে জোরে ডাকতে লাগল—"ভিক্ষু উপালি, ভিক্ষু উপালি।"

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কানে সে ডাক গিয়ে পৌছল। এ কণ্ঠস্বর তাঁর পরিচিত। তিনি ততক্ষণে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

"সুমেধ, তুমি এখানে কি করে ?"

সুমেধ সংঘের নতুন ভিক্ষু। জৈন ধর্ম ছেড়ে নতুন করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। সুমেধ বলল—"আমি খবর নিয়ে এসেছি, রাজা আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে ছেড়ে দিলেও সংঘকে ছেড়ে দেবেন না। তিনি দুয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের সংঘের সাধারণ সম্পত্তি তচনচ করে দেবেন। এবং সংঘ ভেঙে দেবার চেষ্টা করবেন।"

ভিক্ষু উপালি চিন্তান্বিত হলেন। বললেন—"তুমি ঠিক ঠিক খবর পেয়েছ তো ?"

সুমেধ বললে—"আপনাকে ধরে নিয়ে যাবার পর আমিও আপনাদের পেছনে পেছনে অলক্ষিতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার এক আত্মীয়ের সংগে দেখা হল। তিনি লুকিয়ে আমাকে খবর দিয়েছেন। আমিও যথাসম্ভব লুকিয়ে আপনার কি অবস্থা হয়

জানবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এবং আপনাকে যখন ছাড়া হল, তখন আপনার সংগে মিলবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আপনি বেরোলেন প্রকাশ্যে, আর আমি লুকিয়ে। কাজেই বনপথে ঘুরে আসতে আসতে দেরী হয়ে গেল। তবুও আপনি এই পথেই ফিরবেন ভেবে ছুটে আসছিলাম।

ক্রমেই সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। সুমেধকে সংগে করে অন্যমনস্ক-ভাবে উপালি পথ চলছিলেন। সংঘ তাঁর নিজের হাতেই গড়া। প্রথমযৌবনে তিনি পাটলিপুত্র গিয়েছিলেন। শোণ নদ ও গংগার সংগমে বিশাল নগর পাটলিপুত্র। সেখানে তিনি সংঘের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে নিজের দেশ কলিংগে ফিরে এসেছেন। আসবার সময় দেখে এসেছিলেন যে, অশোকের বংশধর বৃহদ্রথ মৌর্যবংশের সিংহাসনে আরোহণ করছেন।

"কি চিন্তে করছেন ?" পথ চলতে চলতে সুমেধ শুধালে।

—"সংঘকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া সম্ভব কিনা, ভাবছি" উত্তর দিলেন উপালি।

—"তাতে লাভ হবে না। যেখানেই সরিয়ে নেন, সেখানেই রাজার লোক যাবে। জনপদের দুষ্ট লোকেরা খবর দেবেই দেবে।" বলল সুমেধ।

—"তবে তুমি কি করতে চাও?" ভুরু কুঁচকে শুধালেন উপালি।

সুমেধ বললে—"এখন কিছু বলব না। আপনি সংঘের জরুরী অধিবেশন ডাকুন। তখন বলব।" ইতিমধ্যে আরো অন্ধকার হয়ে এসেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে তারা উঠল। দুজনে কোনমতে পথ চলতে লাগলেন। হঠাৎ যেন কী একটা মতান্তরের আশংকায় উভয়ে চুপ হয়ে রইলেন। পথ হাঁটতে লাগলেন নীরবে। শেষে পাহাড়ের ভেতর সংঘে এসে পৌঁছলেন।

ঐ রাতেই সংঘের অধিবেশন বসল। চকমকি পাথর ঠুকে দীপশলাকা জ্বালিয়ে দেয়া হল। বেশি নয়, গোটা বিশেক লোক। পাটলিপুত্রের বৌদ্ধবিহারের অনুকরণে এ-সভা বসেছে। জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে আজ রাতেই।

যথানিয়মে প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত হয়ে একজন শলাকাগ্রহীতা বিচারক হলেন। এ ধরনের ছোট বিহারে এর কোন প্রয়োজনই ছিলনা। তবুও পাটলিপুত্রের বড় বড় বিহারের অনুকরণে উপালি এসব নিয়মের ব্যবস্থা করেছেন। দুই বর্ণের শলাকা রাখা হয়েছিল।

উপালি দাঁড়িয়ে বললেন—"আজকে আমাদেব মতবাহুল্য বিচার করতে হবে। কেউ যেন মনে না করেন, আমি সংঘের চালক অথবা সংঘ আমার অধীন। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে নিজ নিজ মতামত দিতে হবে। একদিন বৈশালী বিহারে উপস্থায়ক আনন্দকে ডেকে তথাগত বুদ্ধ স্বয়ং এই ধরনের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, কেউ নিজেকে উপযুক্ত মনে করলে বুদ্ধকে হঠিয়ে দিয়ে সংঘের নতুন নেতা হতে পারেন। আমিও তাই বলছি।"

উপালি বসার পর সুমেধ উঠল। তাকে দেখলেই বোঝা যায় যে বয়স অল্প। সুমেধ জাতে নাপিত। মাস ছয়েক হল তাকে দীক্ষা দেয়া হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ নেই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম জাতিভেদের সৃষ্টি কবে ব্রাহ্মণ ও রাজার জন্য ষড়ৈশ্বর্যের যে বন্দোবস্ত করেছিল, সে-জালিয়াতি বুদ্ধ হঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সাম্যের ছাপ এনেছিলেন নিচতলার লোকদের কাছে।

সুমেধ বলল—"সংঘের উপর রাজরোষ পড়েছে। সংঘের সন্ধান গুপ্তচর ঠিকই পাবে। আমি প্রস্তাব করি, আপাতত আমরা বিহার ছেড়ে আলাদা আলাদা ভাবে ছড়িয়ে পড়ি। সংঘের সাধারণ সম্পত্তি যে-কোনো ভিক্ষুর জিম্মায় দিলেই হবে।

আমরা আরো এক বছর পরে আবার এখানে এসে মিলব। ইতিমধ্যে রাজরোষ শান্ত হয়ে যাবে।”

উপালি উঠে দাঁড়ালেন। সংঘের নেতা হলেও এই মুহূর্তে তিনি সাধারণ একজন ভিক্ষু মাত্র। সুমেধ যেহেতু ভিক্ষু, সেজন্য তার ব্যক্তিগত মতকে তিনি অশ্রদ্ধা করতে পারেন না। সংঘের কানুন বলে যে, সংঘের অধিকসংখ্যক লোকের মতই সংঘের মত। উপালি একবার ভেবে নিলেন, যদি সংঘের অধিকাংশ লোক তাঁর মতকে উপেক্ষা করে। নিজের মনে মনে একটু ঘাবড়ে গেলেন তিনি।

উপালি বললেন—“ভিক্ষু সুমেধের মতানুসারে আমরা যদি আলাদা আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ি, তবে এ সংঘ একেবারেই ভেঙে যাবে। বহুকষ্টে এ সংঘের পত্তন হয়েছিল। আমরা নিজেদের বাঁচাবার জন্য যদি সংঘ ছাড়ি, এবং একা একা পালিয়ে বেড়াই, তবে ব্রাহ্মণের মত স্বার্থপর হয়ে যাব। আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ এবং অন্তকল্যাণের সদ্‌ধর্মের বাণী আর প্রচার করা হয়ে উঠবেনা।”

একটু থেমে উপালি আবার বললেন—“নির্বাণের শান্তি পেতে হলে দুঃখনিবৃত্তির সাধনা করতে হয়। সে সাধনা বাসনা বর্জনের। সংযম, নিষ্ঠা আর বীর্যের দ্বারাই নির্বাণের শান্তি লাভ করা যায়। রাজা খারবেল যুদ্ধ বাঁধিয়ে যে-অপমানের শোধ তুলতে যাবেন, সে অপমানবোধ তাঁর চিন্তার বিকার মাত্র। অথবা জৈন সন্ন্যাসীরা রাজার মাথা খারাপ করেছেন। অথচ, রাজা বুঝতে পারছেন না যে, তিনি সম্রাট অশোকের মতই আবার লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছেন। আমরা যাঁরা সদ্‌ধর্মী, তাঁরা দেশের এই আসন্ন বিপদের মুখে প্রচারধর্ম ছেড়ে পালিয়ে গেলে, স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ কি বলবেন?”

দীপশলাকা নিভে নিভে আসছিল। ঘরের ভেতর স্তব্ধতার মাঝখানে একজন ভিক্ষু উঠে নতুন দীপ জ্বালিয়ে দিলেন। উপালি যখন বসে পড়লেন, তখন সুমেধ আবার উঠে দাঁড়াল। সমস্ত ভিক্ষুদের মুখ চকিতে একবার নিরীক্ষণ করে বল্লে—"আমরা বাঁচলে তো সংঘ, আমরা বাঁচলে তো প্রচার। আমি প্রস্তাব করি, অন্তত ছ' মাসের জন্য আমরা ছাড়া ছাড়া হয়ে আত্মরক্ষা করি। সংঘ এখন ভেঙে দেয়া হোক।"

সুমেধ বসে পড়ার পর আর একজন ভিক্ষু কী জানি বলতে উঠলেন। কিন্তু তাঁর আর কিছু বলা হলনা। বাইরে সোরগোল শোনা গেল।

উপালির ভুরু আবার কুঁচকে এল। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন —"এত রাতে জনপদবাসীরা আবার আমাদের কাছে—"।

কথা শেষ হলনা। ঘরের ভেতরে লোকজন এসে ঢুকল। সুমেধ প্রায় চীৎকার করে বললে,—"অস্ত্রশস্ত্র হাতে এরা তো রাজা খারবেলের লোক।"

সমস্ত লোকই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ঘর গিজ গিজ করছে। আগন্তুকদের ভেতর থেকে একজন বললে—"রাজা খারবেলের আদেশে এ-সংঘকে আমরা আজ এখানেই ভেঙে দিতে চাই। ভিক্ষুরা এ-সংঘ ছেড়ে যে যেখানে পারেন, চলে যেতে পারেন। আমরা কারো ক্ষতি করবনা। খারবেল জৈন রাজা। তিনি হিংসায় বিশ্বাসী নন। তিনি চান যে, কাল থেকে বৌদ্ধরা যেন জনপদে গিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আর শান্তি প্রচার না করেন।"

ভিক্ষু উপালি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুমেধের আওয়াজ সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠল। সুমেধ বললে—"ভিক্ষুগণ, আমাদের যখন কিছু করার উপায় নেই, তখন চলুন বেরিয়ে যাই।"

উপালির অস্ফুট কণ্ঠ আবার শোনা গেল—"হে মহাপুরুষ বুদ্ধ, সুমেধ কি বিশ্বাসঘাতক নয় ?"

ইতিমধ্যে সংঘের শয্যা, আসনপীঠ, পিণ্ডপাত্র প্রভৃতি সাধারণ সম্পত্তিগুলিকে রাজার অনুচরেরা টেনে টেনে বের করতে লাগল। তচনচ করে দিল সমস্ত জিনিসকে।

উপালি তখনো ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে আছেন। রাজার একজন অনুচর এসে উপালিকে বললে, "আর সবাই বাইরে বেরিয়ে গেছে, আপনিও বেরিয়ে আসুন।"

ছলো ছলো চোখে উপালি বললেন—'আমি তো তোমাদের ক্ষতি করছিনা। আমাকে আপাতত ভেতরেই থাকতে দাও। তোমাদের যা করবার, তাত' করেই ফেলেছ।"

—"কিন্তু রাজা খারবেলের হুকুম যে, সবাইকে সংঘ থেকে বের করে দরজা বন্ধ করে দিতে।"

উপালি বললেন—"রাজা খারবেলের মংগল হোক। তাঁকে গিয়ে বলো যে, উপালি কিছুতেই সংঘ-গৃহ ছেড়ে এলেন না।"

একজন অনুচর বললে—"রাজার আর একটি আদেশ এখনো আপনাকে বলা হয়নি।"

—"কি ?" উপালি জিগগেস করলেন।

—"যিনি আমাদের কাজ সম্পূর্ণ করতে বাধা দেবেন, তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে। আপনি আমাদের কাজে কিন্তু সেই বাধাই সৃষ্টি করছেন।"

—"বেশ, আমাকে ধরে নিয়েই চলো," বললেন উপালি।

রাজার অনুচরেরা বিনীতভাবেই উপালিকে ধরল। উপালি তাদের সংগে সংগে বেরিয়ে এলেন সংঘ থেকে। পেছনে একবার চেয়ে দেখলেন, তাঁর সংঘের ভিক্ষুরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা

করছেন। কেবল সুমেধকে তিনি দেখতে পেলেন না। সুমেধ কি তবে?

যদিও সেই তারাভরা আকাশ, উপালির তবু মনে হল, আকাশ যেন আজ তারাঝরা। অনুচরবেষ্টিত হয়ে পথ চলতে চলতে তাঁর স্মরণ হল সম্রাট অশোকের উপদেশঃ "আত্মকল্যাণ সাধনের জন্য আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন আছে।"

বারংবার উপালি মনে মনে জপ করতে লাগলেন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

রাজা খারবেল পরদিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠেছেন, তখন উপালিকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হল। খারবেল শুধালেন—"তাহলে পর পর দু' বার অপরাধ করলেন আপনি?"

উপালি বললেন—"আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।"

—"রাজধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ নিশ্চয়ই অপরাধ"—বললেন রাজা।

উপালি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজা বললেন—"মগধের বিরুদ্ধে অবশ্যই আমি যুদ্ধে নামব। আপনি বাইরে থাকলে জনপদের লোকদের কি কি বলে বেড়াবেন, তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং, এই মুহূর্তে ভেবে দেখলাম, আপনাকে আটকে রাখাই উচিত। কলিংগের স্বার্থে আপনাকে বন্দী করে রাখব।"

উপালি তবুও নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজা খারবেল আদেশ দিলেন—"এই সন্ন্যাসী দেশদ্রোহী। কলিংগের অপমানকে নিজদেশের অপমান বলে গণ্য করেন না। ভাবে মনে হয়, মগধের স্বার্থই এঁর স্বার্থ। এঁকে বন্দী করা হোক।"

তারপর উপালির দিকে ঘুরে জিগগেস করলেন—"কি বলার আছে আপনার?"

উপালি স্মিতহাস্যে বললেন—"তথাগত বুদ্ধের মত আমি কামনা করি, সমুদয় জৈন, সমুদয় অজৈন, সমুদয় মিত্র, সমুদয় অমিত্র, সমুদয় মনুষ্য, সমুদয় অমনুষ্য—শত্রুহীন হোক, বিপদহীন হোক, রোগহীন হোক, সুখী হোক।"

রাজার আদেশে উপালিকে এক গুহার ভেতর আটকে রাখা হল।

গুহার ভেতরে থেকে থেকে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রহরীর কাছে তিনি শুনলেন, রাজা খারবেল মগধবিজয়ে যাত্রা করেছেন। অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলেন উপালি। তাহলে বাঁচানো গেলনা জনগণকে। প্রায় তিন পুরুষ আগের কলিংগযুদ্ধের কথা তাঁর মনে হল। অশোকের কলিংগবিজয় সারা দেশটাকে উচ্ছন্নে দিয়েছিল।

উপালির এই অস্থির দিনগুলির মধ্যে একদিন রানী এসে হাজির। উপালি এই প্রথম দেখলেন রানীকে। চারদিকের শ্যাওলাধরা পাতার ভেতর পদ্মকে।

—"আমাকে চেনো উপালি?"

গুহার অন্ধকারে বাস করতে করতে উপালির চোখের আলো কমে আসছিল ক্রমাগত। স্ত্রী-কণ্ঠের আওয়াজ শুনে জিগ্‌গেস করলেন—"আপনি কে?"

—"কলিংগচক্রবর্তী খারবেল-মহিষী। আমাকে চিনতে পারোনা উপালি?"

সমস্ত মনের ভেতর তোলপাড় হতে লাগল উপালির। কিন্তু তিনি চিনতে পারলেন না অনেক চেষ্টা করেও।

রানী বললেন—"থাক। যখন চিনতে পারছনা, তখন চিনে লাভ

নেই। কিন্তু তুমি স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে আছো কেন? শাস্তির গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে দিলেই তো পারতে।"

উপালি বললেন—"নারীর সংগে আমি কথা কাটাকাটি করিনা।"

—"না, তুমি দেবতা" বিদ্রূপ করে উঠলেন রানী।

উপালি মাথা হেঁট করে বসে রইলেন। তাঁর মনের আর্শীতে তখন সিদ্ধার্থের বিনয়-নম্র রূপ ফুটে উঠেছে। বণিকের পুণ্যবতী কন্যা সুজাতাকে যেদিন সিদ্ধার্থ আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—"ভদ্রে, আমি দেবতা নই, তোমারই মত মানুষ। তোমার কল্যাণ হোক।"

উপালিকে নীরব দেখে রানী বললেন—"আমি যাই। কিন্তু তুমি কি ভুলে গেলে আমাদের শৈশবের দিনগুলি? যখন একসংগে আমরা খেলেছি। তোমাকে ত' প্রথম দিনই এক ঝলক দেখে আমি চিনেছিলাম।"

আমি ভুবনেশ্বরের সেই লাল মাটি।

আজ থেকে দু' হাজার বছর আগে উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে বন্দী অবস্থায় উপালি মারা গিয়েছিলেন। রাজা খারবেল যুদ্ধ জয় করে মগধ থেকে জিনমূর্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। কুমারীপর্বত এবং স্বর্গপুরীতে এজন্য মস্ত উৎসব হয়েছিল। সেদিন কলিংগচক্রবর্তী খারবেলের প্রধান রানী জৈন সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্বেতবস্ত্র বিতরণ করেছিলেন। শ্বেতবস্ত্র বিতরণের সময় শৈশবের খেলার সংগী উপালির মুখখানি মনে হয়েছিল একবার।

তারপর দু' হাজার বছর কেটে গেছে। লিংগরাজ মন্দিরের নিচে বিন্দু সরোবরের সেই জৌলুষও চলে গেছে। সাত-আট শো বছর আগের সেই সরোবর এখন শ্যাওলা-ধরা। একদিন যার জলে ফুটত নীলকমল, সেখানে ফুলের চিহ্নমাত্র নেই। একদিন যার জলে

কালীয় নাগ বাস করত এবং অভগ্ন মৃৎপাত্রে রাজকন্যার হাতে যে দুধ খেত, সে কালীয় নাগও নেই।

তবু সেই সরোবর আছে। আধখানি চাঁদ রাতে মন্দির চূড়ার কাছাকাছি হলে আজো মনে হয় শশীমৌলি শিবকে। যদিও কবির কল্পনা ছাড়া, ও কিছু নয়। কিন্তু কল্পনায় মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরগুলোকে 'ক্ষুধিত পাষাণ' বলে মনে হয় রাতে। ভুবনেশ্বরের পাঁচ শ' মন্দির এখন সন্ধ্যের পর সাপের আড্ডা, ডাকাতের আড্ডা হয়ে উঠেছে।

—"আজ বুঝি আপনারা সভা ডেকেছেন?" জিগ্‌গেস করল কে একজন।

একটা লোক সাইকেল ঠেলে ঠেলে আসছিল। তার পায়ে কাদার দাগ। গায়ে ময়লা কামিজ। বিন্দু সরোবরের তীরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকেই প্রশ্নটি করা হল।

লোকটি বলল—"হাঁ, বাজারেই সভা করব।"

"হাতে কাগজগুলি কি?" অপরজন শুধাল।

"ইশ্‌তাহার। শান্তির স্বপক্ষে ইশ্‌তাহার ছেপেছি।" দরদভরা জবাব এল।

"কিসের শান্তি, কার শান্তি?" অপর ব্যক্তি শুধাল।

ওড়িয়া লোকটি বললে—"আমেরিকা যুদ্ধ চায়। পাক-মার্কিন সম্পর্ক ক্রমেই দশমুণ্ড রাবণের রূপ ধারণ করছে। আমরা পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ চাই না। আমরা শান্তি চাই।"

সরোবরের ওধারে চায়ের দোকানে একটি খাকি প্যাণ্ট-পরা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটি মিটিংয়ের রিপোর্ট নেবার জন্য এসেছে। সে গুপ্তচর। ইশ্‌তাহারওয়ালা লোকটিকে লক্ষ্য করছিল দূর থেকে সে।

একখানি মুখ ভেসে উঠল জলে।

উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের বিন্দু সরোবরের জলে।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একখানি মুখ। রুদ্ধগুহায় হারিয়ে যাওয়া ভিক্ষু উপালির মুখ। প্রায় এক শত পুরুষকে যিনি বেঁধে দিলেন। যাঁকে রাজা খারবেল ভিন্ন দেশের, অর্থাৎ মগধের স্বার্থবাহী বলে অভিযুক্ত করেছিলেন।

সেদিন ভিক্ষু উপালির আশে পাশে যতগুলি মুখ দেখা গিয়েছিল, তাদেরকেও এক এক করে নতুন ঢঙে উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের জলে ভেসে উঠতে দেখা গেল।

কংকাল

॥ ছয় ॥

ডাক্তারকে খুঁজতে খুঁজতে শেষে অপারেশন-থিয়েটারে ঢুকলাম। বেলা তখন একটা। বহরমপুর হাসপাতালের কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত হাসপাতাল জুড়ে একটা বিশ্রামের ভাব। নার্স ও ধাত্রীদের ছুটোছুটি মন্থর হয়ে আসছে। বেশির ভাগ ডাক্তার রুটিন মাফিক ডিউটি সেরে বাড়ি চলে গিয়েছেন। দু' এক জন যাব যাব করছেন।

উড়িষ্যা রাজ্যের দ্বিতীয় শহর বহরমপুর। জেলার নাম গঞ্জাম। বাংলাদেশেও এক বহরমপুর আছে। চিঠিপত্রে সেজন্য বহরমপুরের সংগে উড়িষ্যা রাজ্য বা গঞ্জাম জেলার নাম যুক্ত না-করলে মুশকিল হয়।

শহরটিতে অনেকবার গেছি আমি। উড়িষ্যার প্রায় প্রত্যেক শহরের মত এ-শহরটাও রেলওয়ে স্টেশন থেকে খানিকটা তফাতে। স্টেশন থেকে ডাকঘর-বরাবর পিচঢালা রাস্তাটি চমৎকার। কৃষ্ণচূড়ার চিতার আগুনে কেবল বসন্তে যখন এ-শহরের খানিকটা আকাশ দাউদাউ করে জ্বলে, তখন চোখের সামনে নীল পাহাড়ের ঢেউ কেমন যেন শান্তি আনে।

শহরটিতে তেলেগু ভাষাভাষীর প্রাধান্য। সেজন্য সারা উড়িষ্যায় বহরমপুর স্বপ্রধান। গোটা শহরটাই কেমন যেন পৃথক ধরনের। জমাট এবং মুখর শহর। উড়িষ্যার অন্যান্য শহরে

ওড়িয়া মেয়েরা যেমন সারাদিন গৃহবন্দিনী হয়ে থেকে সন্ধ্যার অপেক্ষা করে—সন্ধ্যা হলে আত্মীয়গৃহে যাবার অছিলায় বেড়াতে পারবে খানিকক্ষণ—বহরমপুরে সে অবস্থা নয়। মেয়েরা এখানে সামাজিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। দিনেও ওরা ঘুরঘুর করে ঘোরে। অন্তত ঘুরতে কোনো সংস্কারগত বাধা আছে বলে মনে হয় না।

উড়িষ্যাকে বারংবার আমি ঘুরে ফিরে দেখেছি। তার পাহাড়, জল, মাটি ও বাতাস আমার বড় পরিচিত। তার লোকগাঁথার ভেতর নারীর কান্না আমাকে কতদিন বিধুর করেছে। তার চাষীর দুঃখ ভাষা পেয়েছে চাষীর গানে গানে।

পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক দেশ উড়িষ্যা। কলকারখানা নেই এমনকি খাস কটকেও। অবশ্যি, অন্ধকার রাতে মহানদীর তীরে দাঁড়িয়ে যে আলোময় সরকারী সুতাকল দেখা যায় দূরে, কেন্দ্রপাড়ার দিকে, তা যথেষ্ট নয়। কাজেই খাস কটকেও সেই ব্যক্তিকে দাবিয়ে রাখার রেওয়াজ। এই রেওয়াজের বিশেষ বলি হলেন অন্তঃপুরচারিণীরা। তাই কটকে গৌরীশংকর পার্কের কাছে প্রথমদৃষ্টিতে একদিন যাকে ভেবেছিলাম জেলখানা, শেষে তাকে জানলাম মেয়েদের স্কুল বলে। হায়দ্রাবাদেও চীনের প্রাচীর দেখে একদিন ভেবেছিলাম, এটা কি ? পরে জেনেছিলাম, জেনানা বিশ্ব-বিদ্যালয় ওটা।

কতদিন কটকের হাইকোর্টের পেছনে কাঠজুরী নদীর পাথর-বাঁধানো মনোরম তীরে বিকেল ও সন্ধ্যেয় আমি ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছি। পুরুষ দেখেছি অনেক, কিন্তু হাওয়া খেতে ওড়িয়া মেয়েদের বড় দেখিনি। তখন বুঝেছি, ক'লকাতার লেক কিংবা বম্বের মেরিন ড্রাইভ অথবা মাদ্রাজের সমুদ্রতীরে ধনতান্ত্রিক আবহাওয়া বইছে। ব্যক্তির খানিকটা সামাজিক মুক্তি। অর্থনৈতিক

নয়, সামাজিক। পাশ্চাত্যদেশে যার নাম দেয়া হয়েছে ডিমোক্রেসী। মেয়েরা ঘুরঘুর করে বেড়াবে, হাওয়া খাবে লেকে, সমুদ্রতীরে। মুঘল আমলের হারেমের মত অন্তঃপুরে বন্দিনী থাকবে না।

ব্যক্তিস্বাধীনতার এদিক বিচার করলে আদিবাসীদের মনে হবে প্রগতিশীল। ময়ূরভঞ্জের কথাই ধরা যাক। বালেশ্বর থেকে শাল-বনের ভেতর দিয়ে যে-পথ গেছে বারিপদায়, সে-পথে সাঁওতালী মেয়েরা আনাগোনা করে। ওরা পুরুষের সংগে বাজারে আসে, পাথর ভাঙে, ক্ষেতের কাজে সাহায্য করে। ওরা পয়সা রোজগার করে, আবার ঘর-কন্নাও করে। এবং পুরুষের মাদলের বোলে ঐ সাঁওতালী মেয়েরা যৌথনৃত্যে খুশির রঙও ফোটায়।

তাই বলছিলাম, সমগ্র উড়িষ্যায় বহরমপুর শহরের চেহারা অন্য ধরনের। ফুলের মালা খোঁপায় জড়িয়ে অন্ধ্র যুবতী ঝট্‌কা চড়ে শহরের এপার-ওপার করে। ঘোড়ায় টানা গাড়ী। ভেতরে বিচালি কিংবা খড় বিছানো। গলায় ঘণ্টা-বাঁধা ঘোড়া সাইকেল-রিক্‌শার চাকার চাইতেও জোরে ছোটে। গাড়োয়ান মাঝে মাঝে পথচারীদের সতর্ক করতে জিভ দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ করে।

দুটো ভাষাই চলে শহরে। যদিও ওড়িয়া এবং তেলেগু ভাষাভাষীর মধ্যে রেষারেষি আছে। আর সে বিবাদ নেই কোথায়? তামিল-তেলেগুতে, মারাঠি-গুজরাটিতে, পঞ্জাবী-সিন্ধিতে, বাঙালী-অসমীয়াতে, বাঙালী-বিহারীতে, সর্বত্র বিবাদ।

বহরমপুর থেকে সমুদ্রই বা কতদূর হবে। কাক-ওড়ার পথের হিসেব নিলে মাইল দশেকের বেশি নয়। সরকারী বাসে খুব তাড়াতাড়ি গোপালপুর যাওয়া যায়। বাঙালীর যেমন সামুদ্রিক স্বাস্থ্য নিবাস পুরী, তেমনি ক'লকাতার গোরা ও ফিরিঙ্গিদের সামুদ্রিক স্বাস্থ্যনিবাস গোপালপুর। ওরা নাম দিয়েছে "গোপালপুর-অন্‌-সী"।

ঐ অমন ছোট্ট জায়গায় উচ্চশ্রেণীর একাধিক য়ুরোপীয় হোটেল আছে। বিলিতী তরুণী মেমরা কস্ট্যুম পরে' সমুদ্র স্নানান্তে যখন জলসিক্ত উদ্ধত দেহে সদর রাস্তা দিয়ে হোটেলে ফেরে, তখন ধন্য হয়ে ওঠে রাহুলের দিশী চোখের লুব্ধ দৃষ্টি। আর গরীব ওড়িয়া শিশুরা যখন "মেমসাহেব, মেমসাহেব" বলে একটি ফুটো পয়সার জন্য বিদেশিনীদের পায়ের তলায় লুটোতে থাকে, তখন আমার চোখ কেবলই কাঁদতে থাকে। তৃতীয় নয়ন দিয়ে দেখি শ্রাবস্তী কিংবা তক্ষশীলার রাজপথ। জ্যোতির্ময়ী বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীকন্যারা চলেছে। আর পায়ে পায়ে করুণা ভিক্ষে করছে দুঃখীরা।

আমি রাহুল অস্থির হয়ে উঠি। হে তথাগত বুদ্ধ, করুণাভিক্ষা ছাড়া তুমি কি অন্যপথ দেখাতে পারলে না? দুঃখযন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথকে তুমি কেন ঐপথে নিয়ে গেলে? তোমার 'ত্রিপিটকে' নির্বাণের পথ অহিংসার পুষ্পগন্ধে ছাওয়া। গান্ধীজীও ঐ পথ বেছেছিলেন। মানুষের দুঃখকে পাপের ফল বলে অভিহিত করা ছাড়া অন্য কোনো দর্শন খুঁজে পেলেন না। তুমি যদি রাজার কুলে না-জন্মে প্রজার কুলে জন্মাতে, তবে তোমার দর্শন খানিকটা বাঁয়ে হেলত।

বুঝতে যে দারিদ্র্য বল, দুর্ভিক্ষ বল, মন্বন্তর বল, সব কিছুর পশ্চাতে রয়েছে শয়তানী বুদ্ধি। মানুষই শয়তান। সেদিন যাদের নাম ছিল শ্রেষ্ঠী। আজকার শেঠজীর মত ওরা তোমার জন্য হয়ত 'ভবন' রচনা করেছিল দিল্লীতে, বম্বেতে। তুমি ওদের চিনেও চেনোনি। চেনোনি তোমার বাবাকেও যিনি প্রজাশোষণ করে রাজকোষে মণিমুক্তো সঞ্চিত করেছিলেন। তুমি অবশ্যি, রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করেছিলে। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে মানব-মুক্তির কথা তুমি চিন্তা করে গেছ। সে যে উপায়েই হোক। তাই তুমি নমস্য। রাহুলের বিপ্লবাত্মক কথাগুলির জন্য অপরাধ নিওনা প্রভু।

এবার বহরমপুর হাসপাতালের কথায় আসা যাক। বেলা তখন একটা। ডাক্তারকে খুঁজতে খুঁজতে হাসপাতালে ঢুকেছি। অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে দেখি ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে টেবিলের ধারে একাকী দাঁড়িয়ে। কাছে কোনো নার্স নেই। টেবিলের ওপরে কাপড়ে-ঢাকা একটি মানুষের শরীর। বোঝা যায়না, সে শরীর স্ত্রী না পুরুষের।

'গুড মর্নিং ডক্টর' সম্বোধনে হঠাৎ তিনি যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। ম্লান হাস্য দিয়ে বললেন—"আমার কোঠায় গিয়ে বসুন, আমি যাচ্ছি।"

কাপড়ে-ঢাকা জিনিসটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুধালেম—"কি ব্যাপার ?"

তিনি ছলোছলো চোখে বললেন—"খুন। খুন ছাড়া আর কি ? দু' গ্রেণ মর্ফিয়া ইনজেকশন দেয়া হয়েছে। গিনিপিগগুলোর ওপরেই তো আমরা এক্সপেরিমেণ্ট করি। হাসপাতালে যে সমস্ত গরীব রোগী আসে, তারা তো গিনিপিগ হবার জন্যই আসে।"

"আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। কি হয়েছে কিছুই যে বুঝতে পারছিনা।"

"উত্তেজিত ? না, না, তা হতে যাব কেন ? হাসপাতালে এত হামেশা হয়। রোগীর মরণ-বাঁচনে আমাদের কি এসে যায় ? কে আমাদের প্রেসক্রিপশান রোগীর সংগে মিলিয়ে শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষা করে ? আমরা এ বিষয়ে দায়মুক্ত। বুঝলেন ?"

"তাত' বুঝলাম। কিন্তু এ কেসটির কি হয়েছিল ?"

ডাক্তার আমার এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন না। পাল্টে জিগ্‌গেস করলেন—"আমাকে ঠিক এই মুহূর্তে খুব ইমোশনেল বলে মনে হচ্ছে কি ?"

"মাঝে মাঝে ইমোশনেল হওয়া ভালো। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না যে?"

"কেসটি মরে বেঁচেছে, এই আপনার জবাব।"

চমকে উঠলাম। মরে তারাই কেবল বাঁচে, যারা বড় দুঃখী। সুখীদের সম্পর্কে এ তত্ত্ব তো প্রযোজ্য নয়। স্মরণ হল, একদিন সালকিয়ায় এক ডাক্তারের ঘরে স্বামীর দেহ ঘাড়ে করে এক আলুলায়িতা পাগলীর আবির্ভাব হয়েছিল। পাগলী নয়, পাগলীর মত দেখতে। স্বামীর কলেরা হয়েছে অথচ এক ফোঁটাও ঔষধ পড়েনি। ডাক্তারের পায়ে পড়ে পাগলী মাথা কুটতে লাগল। ওষুধের দাম পরে দেব, এখন স্বামীকে বাঁচিয়ে দাও। ডাক্তার বললেন, বিনে পয়সায় হবে না। পাগলীর আর্তনাদেও এতটুকু টললেন না ডাক্তার। শেষ পর্যন্ত মুমূর্ষুকে ঘাড়ে করে কাঁদতে কাঁদতে পাগলী আর এক ডাক্তারের উদ্দেশে পথে নামল। মাত্র ঐ পর্যন্তই দেখেছিলাম। মনে আছে, সেদিন তখনই রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমিও ডাক্তারকে "গুডবাই" বলে অন্যপথ ধরেছিলাম।

"কি চিন্তে করছেন?" শুধালেন বহরমপুর হাসপাতালের ডাক্তার।

আমি সহসা জবাব দিতে পারলাম না। কিন্তু চোখ মেলে দেখতে লাগলাম, ডাক্তার ঘরের ভেতর পায়চারী করতে করতে খোলা-জানলা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। তাঁকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। তিনি আমার অতি পরিচিত। সেজন্যই তাঁকে অত প্রশ্ন করবার সাহস পাচ্ছিলেম। না হলে রোগী-রোগিণী সম্পর্কে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য হবার কথা নয়। রোগীর কত মৃত্যু ও মুমূর্ষু অবস্থা, নার্স ও ডাক্তারের কত ঔদাসীন্য এবং কাঠিন্য দেখে আসছি। সংখ্যাতীত হাসপাতালে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই। তাই আমার

পেশা। সদর দেউড়ি দিয়ে ঢুকি, আবার সদর দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসি।

কেবল বালক বালিকাদের ওয়ার্ডের কাছ দিয়ে যেতে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। আহা, ওদের বোবা চোখ। চোখের জলে ওরা প্রকাশিত। বেডের ওপর ওরা চুপ করে শুয়ে থাকে। নার্সের সংগে মায়ের তফাৎ ওরা খুব বোঝে। সামান্য বেতনের অসন্তুষ্টা নার্স মনে করে, রোগীর ভালো মন্দে তার বয়ে গেছে। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল হতে হলে বেঁচে থাকার মত মাইনে চাই। তাই শিশু যখন কাঁদে, তখন ডাক্তার বা নার্স ধমক দেন, রক্ত চক্ষু করেন। শিশু চুপ করে খানিকটা ভয়ে, খানিকটা ঘৃণায়।

আর আমি অবাক হয়ে ভাবি, শিশুরা একদিন বড় হবে। আরো না হয়, কয়েকটি বছর। সেদিন রাষ্ট্র নেবে দুঃখ আর দুঃখীর ভার। তখন সমস্ত অসংগতিকে দূর করবে রাষ্ট্র। শিশু সেদিন ফুল হয়ে ফুটবে। আজকের বালক বালিকারা বড় হবে। সেদিন তারা আমার সংগে দেখা করে আমার কয়েক বছর আগেকার ঔদাসীন্যের যদি কৈফিয়ৎ চায়?

কী সাংঘাতিক কথা। তাই আমি সন্ত্রস্ত হয়ে আছি। ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়ার মত শ্রাবস্তির দুর্ভিক্ষে নার্সের ভূমিকা নিয়েছি মনে মনে। বাছারা, আরো কয়েকটি বছর। চীনের অশোক ফুলের লাল রেণু নিশ্চয় হিমালয়ের ওপর দিয়ে উড়ে ভারতে পৌছুবে। অবসান হবে এ-যুগের জনপদে জনপদে অপুষ্টি, অসুখ, অকালমরণ ও অভাবের যন্ত্রণা।

ডাক্তার ঘরের ভেতর পায়চারী করছেন। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে তিনি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। সে কি অনুশোচনা? করুণা? কিছুই বোঝা গেলনা।

হঠাৎ আমার কাঁধ স্পর্শ করে ডাক্তার শুধালেন—"আচ্ছা, সরকারী হাসপাতালগুলো সম্পর্কে কি মনে হয় আপনার?"

"কি মনে হবে? অন্তত শ্রদ্ধার ভাব নেই। শুনবেন তবে? কলকাতার একটি বড় হাসপাতালের কথাই বলব। সেদিন সেই হাসপাতালে গিয়েছিলাম। দেখি, চল্লিশ বা পঞ্চাশটি টাকা রোজগারের জন্য পূর্ববংগীয় বেকার যুবকের বড় ভীড়। ভীড় মারামারিতে দাঁড়াল। কে আগে গিয়ে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত জমা দেবে! রক্ত দিলেই টাকা। এদিকে কুমীরের মত দরোয়ান দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে। টাকা পেলে বখরা দিতে হবে। বখরার মধ্যেও আবার দরদস্তুর আছে। দারোয়ানকে ঘুষ দিয়ে যা বাঁচে, তাই সই। গরীবের সংসার। কটি টাকার জন্য অধীর আগ্রহে উপবাসিকা মা ও বধূ বসে আছে। আত্যন্তিক অভাব বলছে, ম্যঁয় ভুখা হুঁ, "গরীবের রক্ত চাই"।

"আপনি যে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন।" ডাক্তার হাসতে আরম্ভ করলেন।

কিন্তু হঠাৎ তিনি যেন আবাব গম্ভীর হয়ে গেলেন। অন্যমনস্কতাব ঢেউ আসছে বারংবার তাঁর ওপর।

"আপনার কি হয়েছে, বলুনতো?" জিগগেস করলাম।

সহসা এক নাটকীয় ভংগীতে ডাক্তার টেবিলের ওপর থেকে ঢাকনা তুলে দিলেন। আবেগকম্পিত স্বরে বললেন—"আপনাকে না-বললে আমি শান্তি পাচ্ছিনে। নিজেকে না খুলে ধরলে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মাবা যাব। এই মেয়েটির চেহারা অবিকল আমার বোনের মত। প্রথম তো আমি চমকে গিয়েছিলাম। শেষে রেজিস্টার খুলে দেখলাম মেয়েটি বাঙালী। একটি উদ্বাস্তু মেয়ে। চিল্কা থেকে এসেছে।"

অকস্মাৎ বোকার মতই বলে ফেললাম—"ঠিক দেখেছেন? আপনার বোন নয়ত?"

তিনি যেন ধাক্কা খেলেন মনে মনে। বললেন—"আমার বোন শীলা পট্টনায়ক থাকে ভুবনেশ্বরে। আজই টেলিগ্রাম করে খবর নেব তার কিছু হয়েছে কিনা। ও আমার মাসতুত বোন। কতদিন তাকে দেখিনি। ভগবান করুন, সে যেন ভালো থাকে। কিন্তু চেহারার এমন আশ্চর্য মিল যে, আমি তাজ্জব হয়ে গেছি।"

"কি হয়েছিল এর?"

"সব সিক্রেসী খুলে বলতে পারবনা। আমাকে মাফ করবেন। রিপোর্ট তৈরী হলে পরে কি হয়েছিল, জানতে পারবেন।"

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে বের হবার জন্য দরজা পযন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম। পুনরায় ফিরে এসে শুধালেম, "কাছে গিয়ে মেয়েটিকে একবার দেখতে পারি কি?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়" ডাক্তার অনুমতি দিলেন।

গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে এগিয়ে গেলাম। ঝুঁকে পড়ে মুখখানি দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মনে হল, একে কোথায় দেখেছি। কোথায়, কোথায়? টাটা, রাঁচী, ধানবাদে? ঠিক সেই চেহারা। সহসা স্মরণ হল এ আমার এত কাছের। এরই ছবি বেখেছিলাম এ্যালবামে কিছুদিন। হাওড়া বাস্তুহারা ক্যাম্প থেকে এর ছবি নিয়েছিলাম উনিশশ' আটচল্লিশ সালে। তখন আমি একটা কাগজের সম্পাদনা করতাম। শেষ পযন্ত সখ করে ওর ফটোও এ্যানলার্জ করিয়েছিলাম। তখন মেয়েটির বয়েস ছিল সতের কি আঠার।

ডাক্তার শুধালেন—"কি দেখছেন এক দৃষ্টে?"

"দেখছি একটি চেনা মুখ।"

"সর্বনাশ, আমার মত আপনিও কি স্মৃতির গোলমালে পড়লেন?"

"না, না, একে আমি ঠিক চিনেচি। দেখুনতো রেজিস্টারে কি নাম লিখিয়েছে? পারুল নাম কি?"

ডাক্তার রেজিস্টার আগেই আনিয়েছিলেন। পাতা খুলে চোখ বুলিয়ে তারস্বরে বললেন—"ঠিক, ঠিক।"

"তবে এ আপনার বোন নয়, নিঃসন্দেহ হোন," ডাক্তারকে সান্ত্বনা দিলাম।

—"কিন্তু আপনি কি করে চিনলেন?" তিনি শুধালেন।

—"আন্দাজে। তা হলে এবার দয়া করে বলুন, কি করে কেসটির কি হল?"

ডাক্তার কিছুটা কঠিন হয়ে বললেন—"ঐ অনুরোধ আর করবেন না। ডেথ সার্টিফিকেট আগে তৈরী হোক। লাশও কাটা হোক।"

সেদিনের সন্ধ্যে।

বহরমপুরের এক বিরাট দাঘির পাড়ে বসে জলে চাঁদের আলো দেখছিলাম। জীবনের বহু মানুষের ভীড়ে পারুলও একদিন আমার আলাপের গণ্ডীতে এসেছিল। সেই কথাই ভাবছিলাম। সেই হাওড়া শরণাগত শিবির। দলে দলে যখন বাস্তুত্যাগীরা ক'লকাতায় আসছিল। এক এক দিনে এমন কি দশ হাজার বাস্তুত্যাগী শেয়ালদায় এসে পৌছাচ্ছিল। সেই ভাসমান শ্যাওলার ভীড়ে ছিল ঐ লাজুক মেয়ে পারুল। ওর দেশ ছিল চাঁদপুর। এমন ফুটফুটে মেয়ের খবর না নিয়ে পারিনি। একটি ঘরের সিঁড়িতে সে কাঁচুমাচু হয়ে বসেছিল। আমি ওর খবর নিচ্ছিলাম নোটবুকে টুকে টুকে। বলেছিল, ওর মা-বাবা নেই। ঠিক মনে পড়ছে না, আরো যেন কী বলেছিল দাঙা সম্পর্কে।

তারপর পারুল কোথায় গেল, আর জানা হয়নি। আমি একটি

চাকরি নিয়ে বম্বে চলে গেলাম। সেখানে বসে খবরের কাগজ পড়ে পড়ে খবর নিতাম যে, সরকার পুনর্বাসনে মরীয়া হয়ে লেগেছেন। বিহারে, আন্দামানে, উড়িষ্যায়, বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলে, তরাইএর বনে বনে উদ্বাস্তুদের পাঠানো হচ্ছে। খবর পেতাম, উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায়ও নদীয়া এবং চব্বিশ পরগণার জলা-জংগল আবাদ করে কলোনী তৈরী করছে। অনেক উদ্বাস্তু রোগ-শোকের ভেতর মারা গেল, অনেক উদ্বাস্তু আবার ক'লকাতায় ফিরে এসে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে, এ্যাসেম্বলী হাউসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করল।

আর এক চাকরি নিয়ে আমি কিন্তু কলকাতায় ফিরে এলাম। মনে আছে, সেদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির সামনে, সকালবেলায় দেখা গেল কিছু রক্ত। ফুটপাথে ঐ রক্ত দেখে কিছু কিছু ভীড় জমেছিল।

পুলিশ ভীড় হঠিয়ে দিলে। আমিও ঐ ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছিলাম।

শুনলাম, একটি বছর সাতেকের ছেলে ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে মাকে প্রশ্ন করছে—"ও রক্ত কার মা?"

মা তাড়াতাড়ি শিশুকে টেনে নিয়ে ধরমতলার দিকে চলে গেল। আমিই কেবল খুঁজতে লাগলাম পথ চলতে রবীন্দ্রনাথকে--রাজর্ষির নক্ষত্ররায় আর গোবিন্দমাণিক্যকে। রক্ত? ও কিসের রক্ত?

কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে পারুলকে খুঁজে পেলাম নীলকান্ত চিল্কার তীরে সকালে। রম্ভা স্টেশনের ডাকবাংলোয় আমি উঠেছিলাম। বেরিয়েছিলাম সকালে বেড়াতে।

আধা-সামুদ্রিকরূপে চিল্কা ছিল সামনে শুয়ে। শেষ রাত থেকে শান্ত চিল্কায় বেড়িয়ে এসেছি। চিল্কার কই মাছ নয়, মুগ্ধ করেছিল আমাকে বুনো হাঁসের দল। হ্রদের জলে শান্তিতে ভাসমান হাজার হাজার যাযাবর পক্ষীমিথুন। ওরা এসেছে সাইবেরিয়া কিংবা মধ্য এশিয়া

থেকে। ওরা পৃথিবীর হ্রদে হ্রদে নাকি ঘুরে বেড়ায়। মানস-সরোবর থেকে মণিপুরের লুগতাগ হ্রদে। সাইবেরিয়ার বৈকাল হ্রদ থেকে বেরিয়ে ওরা হয়ত' কখনো আরল হ্রদ বা লবণর হ্রদে গিয়ে পৌঁছয়। কখনো আমুদরিয়া বা শিরদরিয়া নদীর জলধারার ওপর দিয়ে উড়ে' সমরখন্দকে ছুঁয়ে ভারতে এসে পৌঁছয়। কোকিল পাখীর মত ওরাও যাযাবর।

জ্যোৎস্নায় চিল্কা, অন্ধকারে চিল্কা। সমুদ্রকন্যা সেই সুবিশাল হ্রদ আর তার মোহিনী রূপ। হ্রদের মাঝে মাঝে পাহাড়। এপারে রেল লাইনের ওপর দাঁড়ালে দূরে নীলরঙের পাহাড়গুলোকে ভারী সুন্দর লাগে।

বেড়াতে বেড়াতে পারুলের সংগে দেখা। ও চিনতে পারত না, আমিও না। কিন্তু আমি তার ফটো এনলার্জ করিয়েছি, সুতরাং, আমার তো ভুলবার কথা নয়। আমিই ওর স্মরণশক্তিকে খুঁচিয়ে দিলাম। সে চিনল কিংবা চিনল না। মুখে বললে, "চিনেছি।" একটু নার্ভাস টাইপ। সেদিন বেশি কথা হল না।

পরদিন কথামতন আবার ও এল। চিল্কার তীরে পা ছড়িয়ে বসল। আমি তাকে আমার এ্যালবাম থেকে খুলে ফটো উপহার দিলাম। তার নিজের ফটো। যখন সে সদ্য এসেছিল পদ্মার তীরে-ইলিশের-দেশ চাঁদপুর থেকে। তখনো তামাটে হয়ে ওঠেনি কচিমুখ।

কী খুশিই না হয়েছিল। সাত রাজার ধন মানিক পাওয়ার মত। আর নিজের সুন্দর ফটো দেখলে কেই বা খুশি না হয়। স্বয়ং গান্ধীজীর মত লোক শেষ দিকে ফটো তুলতে ভয়ানক আপত্তি করতেন বটে ; কিন্তু লুকিয়ে তুলে' কাগজে ছেপে দিলে খুশিই হতেন। এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কথা কি

বলব। রাষ্ট্রপতি এবং অনেক নেতা রীতিমত ফটো-সচেতন। ফটোর সামনে ওঁরা কী রকম করে চেয়ে থাকেন। খুশির কী আভাস।

রাজা উজীরের কথা ছেড়ে দিই। পারুল ফটো পেয়ে খুব খুশি হল। গল্প বলতে লাগল পা ছড়িয়ে বসে। যাযাবর জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতা। অরক্ষিতা সুশ্রী তরুণীর লাঞ্ছনার বারমাসী। হাওড়া, শালবনী, কটক—কত ক্যাম্পের বিচিত্র জীবন। একজনকে সে বাবা বলে ডেকেছিল। তার পরিবারের সংগে সংগেই সে ঘুরেছে। নদীর মত চলেছে তার উদ্বাস্তু জীবন।

পারুলের কথা শুনতে শুনতে মনে হল, আমি যেন বাংলা দেশের দুঃখের ইতিহাস শুনছি। পূর্ববংগে সে মন্বন্তরের ভেতর দিয়ে কৈশোর পেরিয়েছে। তারপরে দেশত্যাগ। সরকার কুমারী সীতার মত তাকে শিবিরে শিবিরে নির্বাসিত করল। আজ সে পুড়ে' পুড়ে' চিল্কার তীরে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখছিলাম। একটু যত্ন নিলে তার রঙে লাবণ্য ফুটত, চুলে বাহার আসত, চোখে ঔজ্জ্বল্য ফিরত। মেয়েটি একান্ত সৎ, যদিও ভবঘুরে টাইপ।

"আপনি তো আমাকে ভুলে যাবেন ?" পারুল আমাকে উদ্দেশ করে বলেছিল।

আমি সে কথার জবাব দিইনি। ও ইমোশনেল কথার জবাব নেই কিছু।

"একটি চাকরি যোগাড় করে দিতে পারেন ?" আবার জিগগেস করেছিল।

"কি চাকরি ?"

"এই যে চাকরি হয় ; আপনি তো কত দেশ ঘুরে বেড়ান, কত খবর রাখেন।"

"আচ্ছা দেখব,"—এই কথা বলে চিল্কার তীরে ওকে ছেড়ে এসেছিলাম।

সেই পারুলের লাশ হয়ত' এতক্ষণে কাটা হয়ে গেছে।

আমি দীঘির জলের দিকে চেয়ে যেন দেখছি, মাছের মত পারুল মরে শুয়ে আছে। সুষুম্নাশীষকের সংগে ঘনিষ্ঠ দশম স্নায়ু ভেগাস আজ স্তব্ধ। ভেগাস স্তব্ধ বলে পারুলের ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, শ্বাসনালী, পাকস্থলী আজ পরিত্যক্ত। পারুলের শরীরের অন্দরে কেউ আজ কথা কইবে না। যে হৃৎপিণ্ড কোনদিন বিশ্রাম নেয় না, এমন যে খঞ্জন পাখী, সেও আজ নাচ বন্ধ করেছে।

পারুলের কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থাও আজ পরিত্যক্ত। তার গোটা মগজের শাদা আর ধূসর যত পদার্থ, তার ওপরেও ডাক্তার ছুরি চালাতে পারেন। সূক্ষ্মসূত্রের মত স্নায়ুতন্তুর গায়ে গায়ে জড়ানো কোষগুলি, আর স্নায়ুর সংগে জড়াজড়ি রক্তবাহী সূত্রগুলিও পারুলের মৃত্যুর সংগে সংগে পচতে শুরু করেছে।

পারুলের সেরিব্রাম। মানুষের যে-মগজের কার্য কারণের উৎস সন্ধানে যুগে যুগে প্লেটো, বার্টন, গ্যল, ব্রকা, হিৎজিগ, শেরিংটন প্রমুখ রথী মহারথীরা ব্যস্ত হয়েছিলেন—তারই একটি লাশ কাটার ঘরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। হয়ত' পাখীর মত পক্ষ-সঞ্চালন ও ভারসাম্যের উপযোগী করে পারুলের সেরিবেলামই বেশি পুষ্ট হয়েছিল। পারুল আজ অপমৃতা। মেডালা বা সুষুম্নাকাণ্ড পর্যন্ত দীর্ঘায়ত মেরুরজ্জু বেয়ে আর কখনো প্রেমিকের স্পর্শ সুখ আরোহণ করবে না মগজের স্পর্শ কেন্দ্রে। জীবনসংগীতের আরোহণ ও অবরোহণ তার একেবারেই স্তব্ধ হয়েছে।

পারুল বেওয়ারিশ মাল। এমন লাশকে সরকার সম্ভবত কটকে

চালান করতে পারেন। আমার দিব্যদৃষ্টি আজ স্থান ও সময়কে অতিক্রম করছে। কটকের মেডিক্যাল কলেজে আমি যেন স্পষ্ট দেখছি এ্যানাটমি বিভাগে তার লাশ। দেহ তার মডেলের মত। তার চোখের অচ্ছোদপটল অশ্রুহীন।

কতগুলি তরুণ ছাত্রছাত্রী অদম্য ঔৎসুক্য নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। গলিত শবের দুর্গন্ধকে তারা উপেক্ষা করেই ঝুঁকে রয়েছে। আর অধ্যাপক চকচকে ছুরি নিয়ে আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়িয়েছেন। দেহ নয়, তিনি যেন তরমুজ কাটছেন। ভেতরটা কবে যেন লাল ছিল, এখন শুধু মরা রক্ত। তার হৃৎপিণ্ডের অরিক্যুলে ভেন্ট্রিক্যুলে চারভাগ। মাঝখান দিয়ে নীলরক্তের নালা। নীলরক্ত যেখান দিয়ে শোধিত হয়, লাল হয়। ডিগবয়ের তেলের খনির মত। আহা, হৃৎপিণ্ডের চারদিকে নরম ও মসৃণ মেম্ব্রেণের ঘেরাও, ভেতরে পেশীবহুল আর এক আচ্ছাদন, তারপরেও এক নরম, মসৃণ ঘেরাও। ভেতরে রক্ত-পদ্মের মত হৃৎপিণ্ড। আর নাচবে না খঞ্জন। বাঁয়ে পাঁজরের নিচে আধা-লুকানো আধা-চাঁদের মত পাকস্থলী। বস্তিদেশে বৃহদন্ত্রের নাগপাশ। শরীরে চামড়ার নিচে নিচে অসংখ্য নীল জালক।

ডাক্তার শবব্যবচ্ছেদ করছেন। কি খুঁজছেন? মহেঞ্জোদড়োর নগরপত্তন কালে প্রাচীন ইঞ্জিনীয়ারদের কাজ? লাশের অংগে অংগে শিরা এবং ধমনীর নল ও নালাকে? আহা, মেরুদণ্ডকে আঁকড়ে ধরে' প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত মহাধমনী এওরটা। দ্বিতীয় পাঁজর থেকে ষষ্ঠ পাঁজর পর্যন্ত, দু' ইঞ্চি পরিমাণ পুরু স্তন্যবাহী গ্ল্যাণ্ড—মৃতার অবহেলিত যুগল বক্ষ।

লাশ কাটছেন। লাশের চোখের গ্ল্যাণ্ড আর যন্ত্রণায় অশ্রু ঝরাবে না। একদিন চোখের অধ্যাপক এসে চোখ কেটে দেখাবেন কোথায় কর্নিয়া, স্নায়ু, রেটিনা আর আইরিস। একদিন কান ব্যবচ্ছেদ করতে

কানের অধ্যাপকও আসবেন। শেষে আসবেন দাঁতের অধ্যাপক। দাঁত উৎপাটন করে দেখাবেন, মানুষের সংগে কুকুরের দাঁতের তফাৎ।

আর লাশ এ ঘরেই পড়ে থাকবে। থাকবে চাদরে ঢাকা। ক্রমে যেদিন পেশী ও মাংস খসাবার প্রয়োজন হবে, তখন কংকাল রূপে রূপান্তরিত হবে। এমনি করেই কংকালবেশিনী-পারুল ডাক্তারের এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে চালান হবে। কলেজের কত তরুণ ছাত্রের সংগে তার কল্পিতদৃষ্টির শুভদৃষ্টি হবে। মেডিক্যাল কলেজের সেই লাশ কাটার ঘর। যে ঘরে বসন্ত নেই। আছে কেবল হাড়, চোয়াল, পাঁজর ও খুলি। হাড়, নড়বড়ে হাড়। সে শুধু আলনা, ফিবুলা, প্যাটেলা, আরো কত নাম হাড়ের।

হয়ত, আমার ছেলে ভবিষ্যতে ডাক্তারী পড়তে গিয়ে সেই কংকাল নিয়ে কোনদিন নাড়াচাড়া করবে। পারুলকে সে বাঙালী মেয়ে বলে চিনতেই পারবে না।

তিরুভানা

॥ সাত ॥

সুন্দরবনের বিদ্যাধরীকে পেলাম ভিজাগাপট্টমের সমুদ্রতটে।

ঠিক যেন ঐরকম চেহারা। বিদ্যাধরীর কাঁদ কাঁদ মুখের সংগে তিরুভানার মুখের অমন মিল। বিদ্যাধরী বাঙালী আর তিরুভানা অন্ধ্রের নারী। বিদ্যাধরী তো আর ভিজাগাপট্টমে আসেনি। দেখলাম তিরুভানাকে। তার ঠিক ঠিক নামও মনে নেই। যতদূর মনে হয়, ঐ ধরনের কি নামই সে বলেছিল।

সুন্দরবনের বিদ্যাধরী ছিল জেলের বউ। তাকে দেখেছিলাম এক বন্যার দিনে। ক্যানিং থেকে লঞ্চে করে' মাতলা নদী দিয়ে সুন্দরবনের বন্যা দেখতে গিয়েছিলাম। চারদিকে লোনাজলের মাঝখানে এক উঁচু ভিটেয় সে বসে ছিল। তিনদিন ধরে সে উপোস করে আছে। তিনদিন ধরে সে স্বামীর অপেক্ষা করে আছে। স্বামী মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।

জিগগেস করেছিলাম—"তোমার স্বামী কবে থেকে নিখোঁজ?"

—"অমাবস্যা থেকে" উত্তর দিয়েছিল।

আমরা যারা ইংরাজী সনতারিখের খবর রাখি, হঠাৎ তাদের কাছে তিথির হিসেব দিলে গোলমাল লাগে। কিন্তু বিদ্যাধরী চাঁদের সংগে জলের যোগাযোগ করে' সময়ের হিসেব রাখতে অভ্যস্ত। জোয়ার-ভাঁটার হিসেব কষে' কষে' তার পাড়া-পড়শীরা মাছ ধরতে যায়। সুন্দরী আর গরাণ গাছে মৌমাছিরা যে মধুর চাক বোনে, তা-ও তিথি-নক্ষত্রের সংগে জড়িয়ে ফুলে ওঠে।

বিদ্যাধরীর কাঁদ কাঁদ মুখ ভুলবার নয়। সারাদিন সে মুখ আমার মনের মধ্যে লেগে রয়েছিল। সেদিনই সন্ধ্যেয় কলকাতা ফিরে এসেছিলাম। শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ আকাশে যখন উঠল, তখন নির্জন, জলমগ্ন, জনপদে বিদ্যাধরীর আলুলায়িত চুল ও চেহারা মনে পড়তে লাগল। আকাশে শীর্ণ চাঁদের মুখোমুখী এক রোদনভরা নারী। এক পোড়ো ভিটের চারদিকে আদিগন্ত জল। সাঁতার দিয়ে ভিটের দিকে সাপ আসছে এগিয়ে। বিদ্যাধরীর ঘরে কেরোসিন নেই। ঘরের আলো, মনের আলো নিভিয়ে সে বসে আছে।

ভিজাগাপট্টমের সমুদ্রতটে এসে দেখলাম সেই নারী। সেই অসহায়া নারী। সেই ধীবরপত্নী। গায়ে তার মাছের গন্ধ। মহাভারতবর্ণিত মৎস্যগন্ধার মত সে সুন্দরী নয়। এবং তার স্বামীর আর যাই থাকুক, ধীটুকু অন্তত ছিল না। ব্যক্তিগত কৌশল খাটিয়ে কোনো রকমে স্বামী জীবিকা-নির্বাহ করে।

কালো কুচ্‌কুচে নারী। চিক্‌চিক্ করে কালো রঙ। তার ভাষা আমার অজ্ঞাত। এ কোচবিহারের কন্যা নয় যে, আমি পথিক হিসেবে বলি—

"বলো বলো কন্যা, কিবা দুখ,
তোলো একবার তোমার চাঁদ মুখ,
আজ নিতে পারি কন্যা,
কিছু তোমার দুখ হে।"

সংগে এক দো-ভাষী ছিলেন। তিরুভানার মনের কথা বুঝতে আমাকে তিনি সাহায্য করছিলেন। দো-ভাষী ভারতের সর্বত্রই মেলে। অচিন মানুষকে সাহায্য করতে সমস্ত জায়গায় এ-রকম দো-ভাষী খুশি মনে এগিয়ে আসেন।

শহরের ঠিক নিচটায় সমুদ্রের পাড়টা যেখানে খাড়া নেমে গেছে, ঠিক সেখানটায় নয়। কেননা, সেখানে সমুদ্রে মস্ত বড় বড় পাথর। মাছ ধরার অসুবিধে। আরো কিছু এগিয়ে গেলে মাছ ধরার খানিকটা প্রশস্ত জায়গা মেলে। আমরা সে জায়গা অবধি গিয়েছিলাম।

তখন বিকেল বেলা। সৈকতে ঝিকমিক করছিল বালি। বালির সংগে সম্ভবত যে কুঁচোগুলি ছিল, সেগুলি ছিল অভ্রের দানা। গ্রেনাইট জাতীয় আদিম পাথরের গুঁড়ো কিংবা ঐ ধরনের কিছু। সারাটা অন্ধ্র যেন পাথরময়, বিশেষ করে প্রতিবেশী হায়দ্রাবাদ তো পাথরে পাথরে গড়া। পাথরের পাহাড়।

তিরুভানা সমুদ্রের দিকে মুখ করে রয়েছিল। ঝলকে ঝলকে বর্ষার হাওয়ায় চুল উড়ছিল। মেয়েটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, সে কাঁদছে। যাকে বলে হাঁপুস নয়নে কাঁদা।

দো-ভাষী নিজে ভিজাগাপট্টমের লোক। হয়ত' এ-রকম কান্না দেখে অভ্যস্ত। যেমন আমরাও ক'লকাতায় বাঙালী-ভিক্ষুকনীর কান্নায় অভ্যস্ত। সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর থেকে ভিক্ষুকের সমস্ত ছলাকলা আস্তে আস্তে রপ্ত করে নিয়েছি আমরা। সুতরাং, হাসানাবাদের যে ভিক্ষুক রমণী আজকাল বৌবাজার আর কলেজ স্ট্রীটের সংগমে বাস থামলে কান্না জোড়ে, তাকে আমরা গ্রাহ্য করিনে। ক্ষিদেয় মরে যাবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেয়ার করিনে। কিন্তু অন্য রাজ্যের লোক ক'লকাতায় এলে এ দৃশ্য দেখলে অবাক হয় বৈকি। যেমন আমিও সমুদ্রতীরে অবাক হলাম।

অন্ধ্রের নারী। তায় আবার মেছুনী, সুতরাং, গরীব বৈকি। আর সারাটা অন্ধ্রই গরীব। তিরুভানার পরনের কাপড়টাও ময়লা। কোন মতে ঢেকে রেখেছে ওর লজ্জাকে, ওর হৃদয়কে।

বিশাল অন্ধ্র। তাকে গ্রাস করেছিল তামিলী মাদ্রাজ। আজো গ্রাস করে আছে নিজামী হায়দ্রাবাদ। তবু শহীদ রামলুর আত্মদানের ফলে এক নতুন অন্ধ্র তৈরী হয়েছে। এই নতুন রাজ্যের জনপদে দারিদ্র্যের মহিমা ক্লাসিক্যাল। ভিক্ষে আর উপোস, দুটোই গরীবের একচেটিয়া।

ভিক্ষে মানুষকে যাযাবর করে। অন্ধ্রে তাই যাযাবরের সংখ্যা হাজার হাজার। ভূমিহীন এই বেকারেরা রেলস্টেশনে রেলস্টেশনে ঘোরে। বেঘরইন জীবন। গাছের তলায় মাটির হাঁড়িতে রান্না। সংগে আবার নারী ও শিশু। গ্রীষ্মে, খোলা আকাশের নিচেই ভোরের পাখী শিয়রে শিয়রে ডাকে।

আর বর্ষায় প্ল্যাটফর্মে, কিংবা অচল ওয়াগনের নিচে, নয়ত কোথাও আনাচে-কানাচে শুয়ে থাকা। গাড়ী এলে সুবিধে মতন তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চের নিচে, যাত্রীর পা জড়িয়ে শোয়া। এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশন। টিকিট-চেকার সুবিধে পেলেই হাতের ঝাল মেটায়। পনের বছরের ভিক্ষুক-কিশোরীর গাল লাল হয়ে ওঠে, চোখে জল আসে। কিন্তু তবুও চেকারের পা জড়িয়ে ধরে। পাছে চেকার গাড়ী থেকে ঠেলে ফেলে দেয়।

এরা অন্ধ্রের চিরবাস্তুহারা। বালেশ্বরে, খুরদায়, কটকে, বিলাস-পুরে, বড় বড় জংশনে এদের দেখা মেলে।

কী জানি, আমার ধারণা, আরব সাগরের জেলেদের চাইতে বংগোপসাগরের জেলেরা একটু বেশি গরীব। উরাণের যে-জেলে আরব সাগরে মাছ ধরে, তার স্বাস্থ্যও ভালো, অবস্থাও ভালো। কথাটা হয়ত একটু বেমানান লাগল। কিন্তু আমি যদি বলি, বম্বের শস্তরতলী কল্যাণে যে-লাখখানেক সিন্ধী বাস্তুহারা আছে, তারা বাঙালী বাস্তুহারার চাইতে দেখতেও সুন্দর, স্বাস্থ্যও ভালো এবং

অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার, তবে কথাটার গুরুত্ব নিশ্চয়ই এড়ানো যাবে না। কল্যাণের এক রিফিউজী ক্যাম্পে এক রেস্তোরাঁয় বসে একদিন চা-পান করছিলাম। সুন্দর আলোকমালায় সাজানো রেস্তোরাঁ। পাশে এসে এক জোড়া সিন্ধী তরুণ-তরুণী বসল। তরুণীটি যেন মধুবালা কিংবা শাকিলা। যেমন রং তেমন সিল্কের সাজগোজ। অধরোষ্ঠ লিপ-স্টিকে ঘসা। হাওয়ায় উড়ল ইভনিং-ইন-প্যারিস। মেয়েটি রিফিউজী।

আর বাঙলা দেশের রিফিউজী ক্যাম্প? না, কোনমতেই কল্যাণ-ক্যাম্পের পরিবেশ এ দেশে কল্পনা করা যায় না। বাঙলার জনপদ বড় গরীব।

অন্ধ্রের জনপদের দারিদ্র্য ততোধিক। সম্ভবত সেজন্য একদিন তেলেংগানার চাষীরা বিদ্রোহী হয়েছিল। ওয়ারেংগেল আর নাল-গোণ্ডার চাষীরা গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় পাহাড়ে পাহাড়ে শিবাজীর মত গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিল।

ঐশ্বর্যের আড়ালে এত অন্ধকার। দিল্লীর কনট সার্কাস, কিংবা নিদেন পুণার হিরাবাগ থেকে বেরিয়ে অন্ধ্রের তালপাতা বা নারকেল-পাতার ছাউনিদেয়া স্তূপের মত আস্তানায় ঢুকুন। অন্ধ্রের মেথর, জেলে, কুলী, ভিক্ষুক, ঝাড়ুদার লাখ লাখ লোক ঐ সব আস্তানায় বাস করে আসছে। ধীবরের অস্তিত্ব ছিল কালিদাসেব আমলে তো বটেই। মগধরাজ অজাতশত্রুর আমলে অর্থাৎ বুদ্ধের জীবদ্দশায় জেলে, ছুতোর, তাঁতী, মালী, ধোপা, কেরানী -এরূপ পঁচিশ প্রকার শিল্পকর্মীর অস্তিত্ব ছিল। বুদ্ধের আগেও এরা ছিল। কিন্তু ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে এদের আলেখ্য কোথায়? কোথায় গেল তাঁতী, মালী, জেলে বা ছুতোরের বধূ কিংবা কন্যারা? প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জন-পদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ মেঘের ছবি এঁকেছিলেন কালিদাস।

কিন্তু স্পষ্ট করে তো বলেননি, ঐ জনপদ-বধূজনের মধ্যে জেলের কন্যা ছিল কি-না। পরবর্তীকালে প্রাচীনসাহিত্য ঘেঁটে রবিঠাকুর 'মানসী'তে অনেক নারীর রূপ কল্পনা করেছেন। ঘনবর্ষার এক অপরাহ্ণে তিনি কালিদাসের আমলের যে-নারীকে পুনর্বার মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার রূপ এই ঃ

"নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণ সরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা।"

এই আলেখ্যের কাছে না দাঁড়াতে পারে বিরহিনী বিদ্যাধরী, না দাঁড়াতে পারে কাঁদ-কাঁদ-মুখ তিরুভানা।

তিরুভানা সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার ঔৎসুক্যে দো-ভাষী বন্ধুটি মেয়েটির কাছে গিয়ে তেলেগু ভাষায় জিগগেস করলে—"এই কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?"

তিরুভানা মুখ ফিরিয়ে আমাদের দুজনকেই দেখল এক ঝলক। তারপর আরো বেশি বেশি সে কাদতে লাগল।

"সমুদ্রের দিকে চেয়ে কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?' বন্ধু শুধাল।

তিরুভানা হঠাৎ কান্না বন্ধ করল। চোখ ঘুরিয়ে আবার যখন সে আমাদের দিকে চাইল, তখন দেখলাম, ফোলা ফোলা চোখ, ভেজা পাঁতি। বোঝা গেল, সে অন্তত কয়েক ঘণ্টা ধরেই কাঁদছে।

বন্ধুটি খেঁকিয়ে উঠল—"বল্ না, কি হয়েছে?"

"সমুদ্রের দেবতা নিয়ে গেছেন"—বলে দূর সমুদ্রের দিকে বধূটি আঙুল দেখিয়ে দিলে।

"কি নিয়ে গেছেন?" শুধাল দো-ভাষী।

উত্তরে তিরুভানা আবার কান্না জুড়ে দিল। আওয়াজী কান্না।

ঘটনা ঘটেছিল এরূপ।

বর্ষাকালে জেলেদের সংসারে যা হয়। সমুদ্র অবিশ্বাসী থাকলে জেলেদের সংসারে যা ঘটে। অর্থাৎ, দিন-আনা, দিন-খাওয়ার সংসারে যে দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কদিন ধরেই আকাশে ঘনঘটা। কদিন ধরেই সমুদ্রে ঘূর্ণীবায়ুর তোড়জোড়। কিন্তু আকাশে আর সমুদ্রে যাই হোক না, পেটের সমুদ্রে ক্ষুধার মন্থনের বিরাম ছিল না। তিরুভানার আবার একটি তিন বছরের বাচ্চা আছে। তাকে ত' ভাত দিতে হবে মুখে। কিন্তু পয়সা কোথায় চাল কেনার? সমস্ত জেলে পাড়ায় একই অভাব। সকলেরই সব বাড়ন্ত।

জেলে পাড়ায় এ-ক'দিন ঘরে ঘরে অনশন চলছিল। তিরুভানার দুঃখটা বাচ্চাকে নিয়েই বেশি। ছেলেটা ভালো খেতে না পেয়ে লিকলিকে হয়ে গেল। খিদের জ্বালা ছেলেটা সহ্য করতে পারে না।

তিরুভানার স্বামীর দেনাও আছে আবার। গত পোংগল অর্থাৎ পৌষ উৎসবের দেনা এখনো শোধ হয়নি। যে-কমদামী শাড়িটা কেনা হয়েছিল, তাও প্রায় ছিঁড়ে আসছে। কিন্তু ঋণের টাকা দেয়া হয়নি।

অথচ, সমুদ্রের অবস্থা অবিশ্বাস্য। মাছ ধরতে যাওয়া বিপজ্জনক। রাশি রাশি ঢেউ। আথাল পাতাল ঢেউ। পাড় থেকে দূর-সমুদ্রের দিকে চাইলে ভয় হয়। দিগন্তে কালো মেঘ যেন দিঙ্‌নাগের মত সমুদ্রে ঢুকে পড়েছে। জলের রঙ ঘোলাটে, তার মধ্যে মেদুরতা। মেদুরতা আকাশের। আকাশে ঘনঘটা, জলেও ঘনঘটা।

সমুদ্রে খুশিমতন নেমে মাছ ধরা হয়ে উঠছে না তিন চার দিন ধরে। যে-জলে মাছ ঘুরে বেড়ায়, সে জল একটু গভীর সমুদ্রের। পাড় থেকে মাইল দুই যেতে পারলে তবে তো মাছ। রূপোর তলোয়ার, রূপোর পাতা, রূপোর চাকতির মত মাছ। মাছ বেচলে নগদ পয়সা। অবশ্যি, সংসারের দৈনিক খরচেই মিলিয়ে যায় সে নগদ পয়সা। যেমন মিলিয়ে যায় জলে জলে মাছ। পয়সা তেমন বেশি কিছু হয়না। এবং তাও অনিশ্চিত।

তিরুভানা এসে ভীমরাজুর কাছে বাচ্চাটাকে ধপাস করে নামিয়ে দিল। বললে—"আর যে পারিনে।"

"কি ?" জাল শেলাই করতে করতে শুধাল ভীমরাজু। লোকটা তিরুভানার স্বামী। বয়েস তিরিশের মত। চোখের রঙ খানিকটা হলদে, খানিক লালচে।

—"বাচ্চাটা কাঁদছে। দুধ কিনে দাও। আমার কাছে পয়সা নেই।" বললে তিরুভানা।

ভীমরাজু গম্ভীর হয়ে গেল। পয়সা তার কাছে যে থাকে না, একথা তিরুভানা জানে। তবু খোঁচা দেয়। খোঁচা নয়, অক্ষমকে আঘাত করা।

আকাশের দিকে, সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখল ভীমরাজু। আকাশের সেই খলপূর্ণ ভাব।

তিরুভানাকে লক্ষ্য করে সে বললে—"জানিস, সমুদ্রে ঘূর্ণিবায়ু আসবে। কাগজে নাকি লিখে দিয়েছে। না হলে আজ সমুদ্রে নেমে পড়তাম।"

"ও তো কদিন ধরেই শুনছি," বললে তিরুভানা।

"বিশ্বেস হয়না ? বিশ্বেস কী করেই বা হবে। তুই কি বুঝবি সমুদ্রের ?" তাচ্ছিল্যের সংগে বললে ভীমরাজু।

পুকুর নয়, নদী নয়, হ্রদ নয়। সমুদ্র এক পরম আশ্চর্য সৃষ্টি। শীতের খোলা সমুদ্রে হু-হু করে বাতাস ঝড়ের মত। আর বর্ষায় তো এমনিতেই ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল চলে বাতাস। যখন ঝড় আসে—সমুদ্র তখন উন্মাদ। প্রলয়কালীন মত্ততা। তেড়ে-আসা ড্রাগনের মত হাজার হাজার ঢেউ।

দুপুর বেলা তিরুভানা ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাচ্চাটার কান্নায় জেগে উঠে দেখল, ভীমরাজু কাছাকাছি নেই। ভাবল, শহরের দিকে কোথাও তবে গেছে। বাচ্চাটাকে শান্ত করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমোতে আর পারল না। একটি জেলে-বউ এসে তিরুভানার ঘুম ভাঙাল।

"কি হয়েছে?' শুধাল তিরুভানা।

"সর্বনাশ হয়েছে, তোমার আর আমার স্বামী সমুদ্রে নেমেছে নৌকো নিয়ে।"

ছেলেটাকে কোলে করে তিরুভানা ছুটল সমুদ্রের পাড়ে। এসে দেখল, দূরে ঢেউয়ের মাথায় দুলছে আর ডুবছে একখানি জেলে নৌকো। সমুদ্রে প্রচণ্ড ঢেউ। আকাশে সেই ঘনঘটা। কিছু কিছু বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়ার বেগ বাড়ছে।

না, আর উপায় নেই জেলেনৌকো ফেরাবার। ডাকলে শোনা যাবে না, অনেক দূর চলে গিয়েছে নৌকো। ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না চোখে।

"কি হবে?" শুধাল সেই জেলে বউ কাছে দাঁড়িয়ে।

তিরুভানা কোনো জবাব দিলনা। তার মনে পড়ল, আজই স্বামীকে সে খোঁচা দিয়েছে। চোখে জল এল ওর। বৃষ্টির ভেতর বাচ্চাকে কোলে করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু বাচ্চাকে তো বেশি ভেজানো যায় না। কাজেই তিরুভানা ফিরে এল।

ফিরে আসতে আবার শুধাল জেলে বউ—"কি হবে, তবে ?"

"কিছু না, দেখিস ঠিক মাছ ধরে ফিরে আসবে।" নিজের মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে শেষে জবাব দিল ভীমরাজুর বউ। বাচ্চাটাকে আদর করতে করতে বললে—"তোর বাবা আজ বড় মাছ ধরবে রে। এম্নি দিন তো বড় মাছ ধরারই দিন। তুই বড় হলে বাবার মতনই সাহসী হবি।"

ক্রমে বিকেল হল। বাড়ল ঝড়ের বেগ। সমুদ্রের দাপাদাপি শুরু হল। ওরা ফিরে এল না। ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ দেখা দিল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তবু ওরা এলনা। অন্ধকারে প্রদীপ না-জেলে তিরুভানা সমুদ্রের দিকে মুখ করে' বসে রইল।

জেলের দল এই ঝড়ের ভেতর এল তিরুভানার কাছে। খবর নিতে এল, ওরা দুজন ফিরে এসেছে কি-না।

"সাইক্লোন শুরু হয়েছে।" একজন জেলে বললে।

"কেন সমুদ্রে নামল আজ ?' আর একজন শুধালে।

তিরুভানা সব শুনল, কিন্তু জবাব দিলনা। জবাব দেবার কিছুই নেই। যা ঘটছে, তাত' সকলেই বুঝছে।

সারা রাত ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই কাটল। ভোর যখন হল, তখনো বৃষ্টি আছে, কিছু ঝড় আছে। কিন্তু ঝড়ের বেগ কমেছে। তবুও সমুদ্রের ঢেউ যেন পাহাড় চূড়ো উড়িয়ে নেবে। সমুদ্রের মাতলামি কমেও কমছে না।

সেই জেলে বউ এল তিরুভানার কাছে। পেছনে পেছনে তার স্বামী। লোকটি বললে, একটু আগে সে ফিরে এসেছে। কিন্তু ভীমরাজু সমুদ্রে ভেসে গেছে। নৌকো ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে ভেসে গেল, পাত্তা পাওয়া গেল না।

দুই নারী

॥ আট ॥

রাত প্রায় দশটা বাজে।

বম্বের সমুদ্রতীর বহুলাংশে নির্জন হয়ে এসেছে। সন্ধ্যেয় যেখানে ছিল সুশ্রী মানুষের মুখের মিছিল, সেখানটা এখন ফাঁকা। উৎসব শেষের অংগনের মত বম্বের মেরিন-ড্রাইভ পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু কর্পোরেশনের দেয়া দীপান্বিতা এখনো উজ্জ্বলই আছে। মেরিন-ড্রাইভ যেন জাহাজের ডেকের মত। যতক্ষণ ঘুম আসেনা, ততক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখা যায়। যেমন বম্বের নাগরিকেরা দেখে।

মালাবার হিলের সানুদেশ থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমি আসছিলাম। বৈশাখের সমুদ্র ছন্দে ছন্দে আছড়ে পড়ছিল পাথরে। উপরে ক্ষীণপ্রভ চাঁদ। দূরে ঢেউয়ের মাথায় একসার মানিক জ্বলছিল বারবার। কে জানে, ফসফরাসের জ্বালা কি না, কিংবা প্রতিফলিত জ্যোৎস্না।

চার্চগেট স্টেশনে যাবার রাস্তাটি পেরিয়ে এসেছি। পেছনে-ফেলে-আসা দীর্ঘকায় রাস্তাটির দিকে চাইলে মনে হয় কী সুন্দর। কেবল পায়ে-হাঁটার কী সুন্দর বুল্ভার বা রাজপথ। রাস্তার ধারে ধারে আলোর গাছ। রাস্তাকে ছায়া দেয়না, আলো দেয়। রমণীয়া করে বিলাসিনী সিন্ধী রমণীকে। লোভনীয়া করে চিত্র-তারকাদের।

চার্চগেট রিক্লেমেশনের দিকে এসে পড়েছি। এখানে এখনো একটু ভিড় আছে। রহস্যময় ভিড়। এখানে ওখানে একটু নিভৃতির মাঝখানে কাঁকড়ার মত যুগলমূর্তি বসে আছে। জায়গাটাকে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। বম্বের নীল পোশাক পরা পুলিশ। নীল রক্তের প্রতীক। পুলিশ বেশি হৈ চৈ করে না। কেননা, এটা মজুর এলাকা নয়। যে-সব যুগল-মূর্তি বসে আছে, ওরা স্যুট-গাউন পরা। কিংবা ভারতীয় দামী পোশাকে আবৃত। এবং কোলাবা পর্যন্ত সমুদ্রতটের আনাচে-কানাচে হরগৌরীর যুগলমূর্তি এমন অনেক লুকিয়ে আছে। পুলিশ রাতে এই তল্লাটের দেখাশোনাই করে কেবল ; কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের মত মূর্তি আবিষ্কারে এগোয়না। তাহলে চাকরি যাবার ভয় আছে। ছদ্মবেশে কোন দেব-দেবীরা অবস্থান করছেন, জানা নেই। কে জানে বড়কর্তাই বসে আছেন কি-না।

নিতান্ত নিরাসক্তের মত সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনি ডাক—"রাহুলজী"।

ঘাড় ফিরিয়ে বিস্ময়ে চেয়ে দেখি একটি মারাঠি মজুর বউ। অনাবৃত কপালে নীল উল্কি চিহ্ন।

সে আমাকে যতখানি চিনতে পেরে ডেকেছিল, ততখানি তাকে চিনতে পারিনি। আমার অবাক দৃষ্টির মুখোমুখি হয়ে সে বললে—"আমাকে চিনতে পারেন নি? সেই যে প্যারেল ময়দানের সভায় আপনার গলায় প্রধান অতিথির মালা পরিয়েছিলাম। মনে নেই?"

ময়দানের সভার কথা ঠিকই স্মরণ হল। কিন্তু তবু ইতস্তত করছিলাম। সে তখন নিজের পরিচয় দিতে শুরু করল—"নাম শকুন্তলা আমার। আমি সূতাকলের কামগার জনার্দনের বউ। সেদিন ঐ সভায় আমি অন্নাভাউ সাঠের ক্রান্তিকারক গান গেয়েছিলাম। অন্নাভাউর সেই "শিওয়ারিং চলা" গানটি। আপনার মনে নেই?"

—"হাঁ, এবার মনে পড়েছে। কিন্তু তুমি প্যারেল ছেড়ে এত রাতে চার্চগেট-অঞ্চলে কেন? রাত যে অনেক হল। বাড়ি যাবেনা?"

—"আজ বাড়ি নেই, বাবুজি। যে 'চলে' আমি থাকতাম, সেখান থেকে দরোয়ান আমাকে মালিকের হুকুমে হঠিয়ে দিয়েছে। তচনচ করে দিয়েছে আমার জিনিসপত্র।"

—"বা-রে, তোমাকে বের করে দিল। কিন্তু জনার্দন কি করল?"

—"জনার্দনকে ত' সকাল দশটার সময় পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে গেছে। সেই সূতাকলের রাজনীতির ব্যাপার। সাচ্চা লোকটাকে ঝুঁটা লোকগুলো ধরে নিয়ে গেল। আর আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ওরা মাটিতে ফেলে গেল, বাবুজী।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শুধালেম—"আজ রাতে তুমি কোথায় থাকবে শকুন্তলা? কোথায় শোবে?"

লক্ষ্য করলাম ওর মুখে ম্লান হাসি। বললে, "হর্ণবি রোডে, কিংবা ধোবি-তালাওয়ে কোনো গাড়ী-বারান্দার নিচে। চার্চগেট অঞ্চলে রাতে শোওয়া ভারী কঠিন ব্যাপার। পুলিশ বড় গোলমাল করে।"

"তুমি কি সন্ধ্যে থেকেই এখানে বসে আছো? কিছু খাওনি?"

আমার একটা আকস্মিক ব্যস্ততা লক্ষ্য করে সে বললে—"খেয়েছি। দু' টুকরো পাঁউরুটি আর পাতলভাজী দিয়ে পেট ভরিয়েছি। আমার আর ক্ষিদে নেই।"

"—তোমাদের ছেলে মেয়ে নেই শকুন্তলা?"

এবারে মাথা নিচু করলে মজুর নারী। হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়েছে। বাঙালী মেয়ের মত নখ দিয়ে পাথর ঘষতে ঘষতে বললে—"এখনো মা হইনি। আরো তিন চার মাস পরে মা হব।"

—"তা হলে তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর পরিশ্রান্ত হয়ো না। তুমি ঐ পাথরের উপর বস।" এই বলে একটা জায়গা ওর জন্য নির্দেশ করলাম।

বউটি বসল। ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বুঝলাম, সত্যিই সে গর্ভিণী। ভারী দুঃখ হতে লাগল। এই গৃহ-বিতাড়িতা গর্ভিণীর জন্য। মুখখানি ওর নাসিকের আঙুরের মত শ্যামল এবং থলো থলো।

এদিকে কী আশ্চর্য। আমরা খানিকটা পথ আলাপে আলাপে হেঁটেছিলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, যেখানে শকুন্তলার সংগে প্রথম দেখা, তার থেকে আমরা খানিকটা দূর এগিয়ে এসেছি। যেখানে শকুন্তলা বসল, তার কাছেই আগে থেকে একটি মেয়ে বসে আছে। অবশ্য যে বসে আছে, সে এ পাড়ারই অধিবাসিনী। খাস চার্চগেটের বাসিন্দা। মেয়েটি আমার পরিচিতা।

মেয়ে নয়, বউ। বম্বের সৌখীনতমা বাঙালিনী। তার পরিচয় না-দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বম্বের বাঙালী মহল্লায় সে যত পরিচিতা, তার চাইতে বেশি পরিচিতা গুজরাটি মহল্লায়। শেয়ার মার্কেটের দরদস্তুরকারী অনেক ব্যবসায়ীই তাকে চেনে। তাকে চেনে বম্বের হীরাজহরতের দোকানগুলি। যদিও সে হীরা জহরত তেমন কেনেনা, কিন্তু দোকানগুলিতে হামেশাই ঢুঁ মারে। তাকে চেনে ক্রফোর্ড-মার্কেটের মুসলমান ফলওয়ালারা। তাকে চেনে হোটেল তাজমহলের পুরোনো বয়গুলি।

আমাকে একটি মজুর-স্ত্রীর সংগে কথা কইতে দেখে সম্ভবত প্রথমে কৌতুক এবং পরে ঘৃণা বোধ করেছে উত্তমা। তাই লক্ষ্য করলাম, নিঃসাড়ে সে বসে আছে।

"চিনতে পারেন, উত্তমা ?"—জিগগেস করলাম, এগিয়ে এসে।

"খুব।" তারপর জিগগেস করল পাল্টে—"এ কে ?"

"প্যারেলের এক মজুর বউ। গৃহবিতাড়িতা। আলাপ করবেন এর সংগে ?"

"না, না, আমি আলাপ করতে চাইনে।" উত্তমা ছুঁৎমার্গের যন্ত্রণায় যেন কুঁকড়ে গেল।

"বেশ আলাপ না হয় নাই করবেন। কিন্তু একটা অনুরোধ, আপনি একে এক রাতের জন্য আপনার বাড়ির সিঁড়ির কোণায় শোবার জায়গা দিতে পারেন ?"

উত্তমা রাজী হলনা। বললে,—"কে-না-কে। শেষে পুলিশের আবার হাংগামা হোক। আমি ঝক্কি নিতে পারবনা।"

শকুন্তলা হাজার হোক নারী। আমাদের বাংলা ভাষায় কথাবার্তা অত না-বুঝলেও একটা জিনিস ঠিক বুঝতে পারছিল। সেটা হল গরীবের প্রতি ধনীর অবজ্ঞা। সে একটু জোরে চেঁচিয়ে হিন্দীতে বলল—"রাহুলজী, আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি যেখানে সেখানে নিরাপদে রাত কাটিয়ে দিতে পারব।"

শিবাজীর দেশের এই শ্রমসহিষ্ণু নারীর চোখের দিকে তাকালাম। দেখলাম, দূরাগত আলোর আভায় সে প্রদীপ্ত হয়ে আছে। তাকালাম বিলাসিনী উত্তমার দিকে। চাঁদ ও বিজলী বাতির বিকীরিত আলোকচ্ছটায় উত্তমার কাজলটানা চোখও উজ্জ্বল।

কিন্তু আমি কী চেয়েছিলাম ? চেয়েছিলাম, নারী নারীকে চিনুক। বাণিজ্য-নগরীর সৌখীন নাগরিকা চিনুক তার অবজ্ঞাত জনপদের বোনকে।

অকস্মাৎ আমি হেসে উঠলাম। স্মরণ হল, কিছুদিন আগেও কী এক স্ত্রী মহামণ্ডলের সভায় নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে উত্তমাকে মহা-উদ্যোগী হিসেবে দেখেছি। শকুন্তলার স্বাধিকার

প্রতিষ্ঠা কি নারী জগতের বাইরে? আসলে উত্তমার আগাগোড়াই ভণ্ডামি। আর উত্তমারই বা একার দোষ কেন? ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজের নারীরা অনেকেই কৃষাণ ও মজুর রমণীর সুখ দুঃখের সংগে গাঁটছড়া বাঁধতে একান্ত নারাজ।

উত্তমা যেহেতু আমাকে খুব অশ্রদ্ধা করে না, তাই আমাকে সহসা হাসতে দেখে একটু ভড়কে গেল। ভাবল, কিছু বোকামি করে ফেলেছে কোথাও। জিগগেস করল —"হাসছেন কেন?"

—"হাস্যি ত' নয়, এ আমার ক্ষোভ উত্তমা। ক্ষোভের ছদ্মবেশী হাসি। আপনি বঙ্গের বিরাট ধাঁধা হতে পারেন, কিন্তু আসলে আপনি বড়ই দুঃখিনী।"

উত্তমা আমার কথা শুনে প্রথমে মুচকে হাসল। তার কাণের দুটি হীরার গয়নাও যেন সংগে সংগে হাসল। ফিরিংগির মত বব-করা চুলে চাঁদের আলো যেন এই প্রথম ঠিকরে পড়ল।

অধরোষ্ঠের লালিমা উঠল টলমল করে। ময়ূরীর মত হাসল সে ঘাড় বেঁকিয়ে। ভ্রূভংগী করল। ভ্রূভংগীতেও বিদ্রূপের আভাস।

শকুন্তলা দেখলাম ঠিক এই অবস্থার মাঝখানে আস্তে আস্তে সরে পড়ছে। বেশ দূরে চলে গিয়েছে। চীৎকার করে ডেকে বললাম, "শকুন্তলা, দাঁড়াও।"

অদূরে ছায়ার মত শকুন্তলা দাঁড়াল। উত্তমাকে লক্ষ্য করে বললামঃ "কাল আর্ট সোসাইটির মিটিং-এ যাবেন তো? ফ্লোরা ফাউন্টেনে? সেখানে কথা হবে।"

উত্তর না-নিয়েই আমি ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে শকুন্তলার কাছে এসে বললামঃ "শকুন্তলা, তোমাকে খানিকদূর এগিয়ে দেব। তোমার এমনিতেই শরীর ভালো নেই। তোমার দুঃখের ভাগ নিতেই এলাম।

তোমার জীবনের কথা বলো। তাই তো তুমি গোড়ায় বলতে শুরু করেছিলে। না?"

"আমার সাতারা জেলায় বাড়ি, বাবুজী। জনার্দনের বাড়িও আমাদের বাড়ির কাছাকাছি। আমরা এক গাঁয়েরই লোক। ধানী জমি ছিল আমাদের কিছুটা। বছর বছর জমিতে ধানবোনা, চারা রোয়া আর ফসল তোলার কাজ গাঁয়ের অন্যান্য মেয়ের মত আমিই করতাম।

"বয়স বাড়ার সংগে সংগে আমার নেশা হয়ে উঠল বম্বে দেখার। জনার্দন মাঝে মাঝে ছুটিতে গাঁয়ে যেত। সে বলত-কামগার ময়দানের গল্প। বলত বম্বে, অমলনীর, খান্দেশ, আমেদাবাদের মজুরদের কথা। বম্বে সম্পর্কে আমার বড় দুর্বলতা ছিল। আমি স্বপ্ন দেখতাম, মোটরে চড়ে আমি মালাবার হিলে উঠছি। স্বপ্ন দেখতাম. সিল্কের শাড়ি পরে মহালক্ষ্মীর মন্দিরে পূজা দিতে গেছি।

"শেষে জনার্দনের সংগেই আমার বিয়ে হল। বিয়ে হবার মাস খানেক আগে থেকেই খুশির সমুদ্রে ভাসছিলাম। কিন্তু বিয়ে হওয়ার পর বম্বে এসে মজুরদের ব্যারাক অর্থাৎ "চল" দেখে চুপ্সে গেলাম। কিন্তু তবুও বম্বে। এমন অপূর্ব মহানগর। এর এক কোণায় অন্তত জায়গা পেয়েছি। তাই হল সান্ত্বনা।

বিকেলে মাঝে মাঝে স্বামীর সংগে গিরনী কামগার ময়দানে আসতাম। পায়রা যেন খোপ থেকে উড়ে এসে ঘাসের উপর বসত। সেই পায়রা আমি। জনার্দনের সংগে বাদাম-ভাজা খুঁটতাম। সে বলত—"এ ময়দান যে-সে মাঠ নয়। এর মাটি পবিত্র। এ মাঠকে দুর দূরান্তর থেকে দেখতে আসে শ্রমিক শিশু। রক্তের ঐতিহ্যে এর আকার তিনকোণা নিশানের মত।"

"বম্বে আসার মাস খানেক পরেই এল পয়লা মে। আগের সারা দিন সারা রাত ধরে ঝাণ্ডার জন্য রঙীন কাগজ কাটলাম তিন কোণা করে। শেষ রাতে ভিনসেণ্ট রোডে জনার্দনের হাত ধরে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম আরো অনেকে এসেছে। তখনো ভোর হবার দেরী। আমরা তাড়াতাড়ি করে' রাস্তার পিচের উপর শাদা রঙে কাস্তে-হাতুড়ির আল্পনা দিলাম।

আল্পনায় আল্পনায় দাদার থেকে লালবাগ পর্যন্ত সারা পথ ছেয়ে গেল। ভোরের লাল রঙা বাস যখন চলতে আরম্ভ করল, তখন দেখা গেল, বড় রাস্তার দুধারে লাখ লাখ লালরঙের নিশান, লাল ফুল, লাল ঝালর। সেদিন প্রথম করলাম মে-দিবসের উৎসব। বম্বের ষাটটি সূতাকলের মজুরদের প্রধান উৎসব।

পাশের খোপের নতুন বউ দুর্গা আমার বন্ধু। সে কিছু মিঠাই নিয়ে আমার আঙিনায় এসেছিল। আমাকে মিঠাই খেতে দিয়ে বললে—"শকুন্তলা, এর আগে এমন উৎসব আর দেখেছিস?"

—"না, এমন দেখিনি। গাঁয়ে আমাদের নতুন ফসলের উৎসব হত। কিন্তু এমন জাঁক-জমক করে' ত' হত না।"

দুর্গা বললে—"আজকে দুটো সভা হবে। একটা হবে গিরনী কামগার ময়দানে। আর একটা হবে ওর পাশের ময়দানে। তুই সভায় যাবি তো? কোনটায় যাবি?"

বললাম—"স্বামী যেটায় নিয়ে যাবেন।"

সে বললে—"আমরা প্রজা সমাজবাদী। কিন্তু তোর স্বামী তো সাম্যবাদী। তোরা যাবি অন্য সভায়।"

দুর্গা চলে গেল। স্বামী ফিরে এলেন। এসেই বললেন,—"শকুন্তলা, তোমার গলা খুব মিষ্টি। আজ তোমাকে গান গাইতে হবে সভায়। এসো, গান শিখিয়ে দিই।"

স্বামীর শেখানো সেই অন্নাভাউয়ের গান যে-সভায় আমি গাইলাম, সে সভায় রাহুলজী ছিলেন প্রধান অতিথি। আপনাকে সেদিন বক্তৃতা দিতে শুনলাম। সেদিনই চিনলাম আপনাকে।"

শকুন্তলার কথা নিবিড় মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। ও ভাঙা হিন্দীতে কথাগুলি বলছিল। আমার সংগে প্রথম যোগাযোগের মাহেন্দ্রক্ষণকে সে বর্ণনা দিচ্ছিল।

"কিন্তু রাহুলজী, শৈশবে আমার যে স্বপ্ন ছিল, সে স্বপ্ন বম্বেতে থাকতে থাকতে ভেঙে গেল। ঐ একফালি কোঠা। পায়রার খোপের মত ছোট। তাতে যেন বন্দিনী বলে মনে হত। রাতে ত' নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হত। কোথায় আমাদের মেঠো হাওয়া আর কোথায় এ রুদ্ধ বাতাস। জনার্দন যে-মাইনে পেত, তাতে করে মোটর চড়া যায় না, দামী শাড়ীও কেনা যায় না। শুধু কোনো মতে বেঁচে থাকা। জনার্দন বলত, "দেখো, এমন একদিন আসবে, যখন মজুররাজ কায়েম হবে। তখন আমরাই সুখী হব।"

শকুন্তলার পাশাপাশি চুপচাপ হাঁটছিলাম। ও যখন কথা বলা বন্ধ করল, তখনো চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম। ওর নিঃস্বতা অনুভব করাছলাম সমগ্র হৃদয় দিয়ে। বাণিজ্যনগরী ওকে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরেছে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে রেল লাইনের ওভার-ব্রীজ পেরিয়ে এসেছি, তাও ঠিক খেয়াল ছিল না। ধোবিতালাওয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি, যখন টের পেলাম, তখন শকুন্তলা বললে--"আমাকে বিদায় দিন এবার। আপনার হোটেলে আপনি যান, আমি এদিকে কোথাও শুয়ে পড়ব। রাতটা কোনো মতে কাটিয়ে দেব।"

চারদিকের প্রাসাদগুলির দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। কোঠায় কোঠায় সুখ-শয্যায় নরনারী ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু শকুন্তলার আশ্রয়

আজ ফুটপাথ। ওর জন্য আকাশ আজ অনাবৃত। কোনো দূর সম্পর্কে আত্মীয় থাকলেও সে আজ কোথাও আশ্রয় নেবেনা। ভাবী মা আজ ফুটপাথেই শয্যা রচনা করবে।

কী-ই বা করার আছে আমার। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে যখন হোটেলের পথে পা বাড়ালাম, তখন শকুন্তলা বললে—"পরশু দিন আবার চার্চগেটের ঐ জায়গায় আসবেন। আপনার সংগে আবার দেখা হবে।"

আর্ট সোসাইটির বিশেষ অধিবেশন।

শিল্পকলার সমঝদার হিসেবে বহু নরনারী জমায়েত হয়েছেন। গুজরাটি, পার্শী, মারাঠি, বাঙালী। যাদের টাকা আছে তারাই এখানকার মেম্বারশিপ পেতে পারেন। আর্ট বুঝুন আর না-ই বুঝুন, আপনার ব্যাংক-ব্যালেন্স থাকলেই আপনি আর্টের সমঝদার।

ক'লকাতার কথা মনে হল। যে-কোনো বড় বড় উচ্চাংগের সংগীতের অধিবেশনে যাঁরা সর্বোচ্চ আসনের টিকিট সংগ্রহ করেন, তাঁরা বড়লোক। ধনী মারোয়াড়ী কিংবা ধনী বাঙালী দিয়ে সভা পূর্ণ হয়। গরীবেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান শোনে। মাঝ রাতে যখন সংগীতের আসরে ধনী শ্রোতার নাক ডাকে, তখন ফুটপাথে জ্বলজ্বল করে রসমুগ্ধ গরীব-শ্রোতার চোখ।

উত্তমা তার শ্রেষ্ঠী স্বামীকে নিয়ে সভায় এসেছে। স্বামী মোটা-সোটা মানুষ। সারা দিন শেয়ার-মার্কেটে ঘোরাঘুরি করার পর এ সভায় এসে কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে। বয়েস তো ষাটের কাছাকাছি হল।

উত্তমা তার গুজরাটি স্বামীকে ঠেলে দিলে—"চুনিলাল, এখানে

ঘুমিও না। তুমি এখানে চেয়ারে বসেছো, তোমার গদিতেও নয়, তাকিয়া ঠেসান দিয়েও নয়।"

চুনিলাল অতশত বোঝে না। সে এ-সভায় এসেছে কেবল উত্তমার অনুরোধে। সেও এ সোসাইটির আজীবন সভ্য। একতাড়া নোট ফেলে দিয়ে সভ্য হওয়া—এ তো সোজা বাত। আর নোটগুলিও যেখানে ঠিক নিজের নয়।

কিন্তু চুনিলালের আজ বড় ঘুম পাচ্ছে। মোটাজীর বাড়িতে যে দহি-বড়া খেয়েছিল বিকেলে, তাতে হয়ত' কিছু সিদ্ধি ছিল। হয়ত' ছিলনা। কিন্তু ঘুম পাচ্ছে। আর ঘুমোলে নাক ডাকবেই তো।

রগড়ে রগড়ে লাল হয়ে গেল চুনিলালের চোখ"। শেষে উত্তমাকে বললে—"না, খুব ঘুম পাচ্ছে আমার। তুমি পরে এসো। আমি যাই।" এই বলে সে সভা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

চুনিলাল চলে যাওয়ার পর মিঃ মুখার্জী এসে উত্তমার পাশে বসলেন। এ সেই মুখার্জি, যার সংগে উত্তমার একটা রহস্যময় সম্পর্ক আছে বলে লোকে বলাবলি করে। মিঃ মুখার্জি অধুনালুপ্ত এক ব্যাংকের বম্বে-শাখার এজেণ্ট। মাথার টাকে কিছু কাঁচা-পাকা চুল।

মিঃ মুখার্জি উত্তমার কানে কানে বললেন—"আজ তোমাকে অপূর্ব সুন্দরী লাগছে-। তুমি যেন প্রাচীন গ্রীসের মহাশ্বেতা মডেল।"

উত্তমা বলল—"আমার বড় টাকার টানাটানি। শ'খানেক টাকা চাই। এখনই দিতে পারবে?"

নীরবে মিঃ মুখার্জি উত্তমাকে একশত টাকার একটি নোট দিলেন। উত্তমা নোটটি ভাঁজ করে ভ্যানিটি-ব্যাগে রেখে দিয়ে মিঃ মুখার্জির হাতে হাত রাখল। হাস্য নয়, যেন লাস্য ফুটে উঠল উত্তমার মুখে চোখে।

আর্ট-সোসাইটির বিশেষ অধিবেশনে একটা হযবরল প্রোগ্রাম চলছিল। ইতালী, ফরাসী এবং বাঙালীর শিল্পসাধনা নিয়েও ভাসাভাসা আলোচনা হল। সব শেষে রবিঠাকুরের শিল্প নিয়ে বলতে উঠলেন দিল্লীর হেনা সমাদ্দার। বাঙালিনী।

চোস্ত হিন্দীতে বক্তৃতা শুরু করলেন তিনি। কিন্তু শিল্প ছেড়ে শিল্পীকে নিয়েই বলতে লাগলেন। "গুরুদেবের চেহারা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ভাস্কর রোদ্যাঁর মত। কী অপূর্ব রঙ। তাঁর গদ্য-পদ্যের অনেক বইও আমি পড়েছি। অবশ্যি, ইংরাজী অনুবাদগুলিই পড়তে পেরেছি।"

হেনা বললেন—"আপনাদের অনেকের মতই আমি বাংলা জানিনা। যদিও আমি বাঙালী। সরোজিনী নাইডুও তো তেমন বাংলা বলতে পারতেন না। দিল্লীতে থেকে থেকে উর্দু শিখেছি বাংলা শেখা হয়নি। কাজেই গুরুদেবের মূল বইগুলো এখনো পড়া হয়নি। কিন্তু গুরুদেবের আর্ট চোখে দেখার জিনিস। অপূর্ব সাধনা। তাইত' গুরুদেবকে আমার আশ্চর্য লাগে। ভক্তি করতে ইচ্ছে করে, পূজো করতে ইচ্ছে করে। ফুল দিয়ে সাজিয়ে। ধূপ-ধুনো আর চন্দন দিয়ে। ওঁ রবীন্দ্রনাথায় নমঃ।"

বক্তৃতার পর সভা শেষ হল। মিঃ মুখার্জি সভাগৃহে রয়ে গেলেন। পার্শী, গুজরাটি সকলের সংগে ব্যবসায়-সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার এই তো শুভ লগ্ন। এ লগ্ন কেবল এ ধরনের সভাসমিতির পরেই আসে। এবং এ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কিত্‌না রূপেয়া ছিল, তারও একদফা জিজ্ঞাসাবাদ হবে।

আজাদ ময়দানের পাশ দিয়ে একটি সুন্দর রাস্তা বেরিয়েছে। উত্তমা সভা থেকে বেরিয়ে এই রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তার পাঁচফুট সাত ইঞ্চি লম্বা দেহের গুলাবী রঙ যেন আলো করল গাছের নিচে

নিচে ছায়াকে। সন্ধ্যে মিলিয়েছে অনেকক্ষণ। আকাশে তারা উঠেছে সবগুলি। উত্তমার গ্রীবা রাজহংসীর মত। পাতলা সবুজ সিফনে তার অবয়ব জড়ানো।

ওর আহ্বানে আমিও সংগ নিয়েছি তার। ক্লান্তির মধ্যেও একটা সতেজ পদক্ষেপ করে সে চলছিল। একটা ঝাঁকড়া-মাথা গাছের ছায়ায় এসে বলল—"চলুন ময়দানের ঘাসে গিয়ে একটু বসি।"

বারংবার লক্ষ্য করছিলাম ওর হাতে-আটকানো একখানি বই। আমার কৌতূহল অনুভব করে উত্তমা বলল—"অচিন্ত্য সেনগুপ্তের নতুন বই পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি। একবার পড়ে ফেলেছি। আবার পড়ব। বইখানি হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করেনা।"

বললাম, "ওঃ, আপনি বুঝি দেবদেবীতেও ভক্তি রাখেন।"

উত্তমা বললে—"লেখকের কী ভক্তিমাখা দৃষ্টি। লেখক যেন বিবেকানন্দের মতই একজন। এমনি অচলা ভক্তি থাকলে মুক্তি পাওয়া যায়।"

বললাম, "ভক্তি কি-না, জানিনা। তবে গুজব যে, প্রকাশক এবং লেখক উভয়েই এক বইয়ে বড়লোক হয়ে যাচ্ছেন।"

উত্তমা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে,—"আপনি কি দেবীকে ব্রহ্মময়ী বলে মানেন না?"

"আপনি কি বিজ্ঞান বিশ্বাস করেন?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"করি।" উত্তমা উত্তর দিল।

"না করেন না। করলে বুঝতেন সারাটা বইয়ে শুধু আধিদৈবিক, আধিভৌতিক গল্প আছে। যিনি ভুগছেন ম্যালেরিয়ায় আর কালাজ্বরে, তার সম্পর্কে আভাসে বলা হয়েছে যে, তিনি দুনিয়ার পাপের জ্বালা নিজের শরীরে তুলে নিয়েছেন। জানেন, রোগজীবাণুর সংক্রমণে ব্যাধি হয়। ওঁরাও সাধারণ মানুষ ছিলেন। ওঁদের শরীরে

বারংবার আমার আপনার মতই ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছিল। কিন্তু ব্যাধিকে নিয়ে কত ব্যাখ্যাই না খাড়া করা হয়েছে।"

"আপনি তাহলে লেখকের দৃষ্টিকে সত্য বলে মানেন না?"

এবার উত্তমার দিকে চেয়ে যেন আমার হাসি পেল। বললাম— "দরজা ছিল বন্ধ। ভেতরে যাবার উপায় নেই। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ওঁৎ পেতে ঘুলঘুলিতে চোখ রেখেছিলেন। সারদামণিকে রামকৃষ্ণ যেই সম্বোধন করলেন—"মা, মা," অমনি রিপোর্টারের মত অচিন্ত্য চটপট নোট করে নিলেন।"

উত্তমা রাগ করে বললে, "এ সব আপনার ফাজলামি।"

—"না, না, একেই তো আপনারা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। না-হলে গ্রাম্যদেবী সিংহবাহিনী হেঁটে এসে অসুস্থ সারদামণিকে তুলে ধরেন। শ্রীমা আকাশের দিকে চেয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেই ঝরঝর করে বৃষ্টি আসে- -এ সব রূপকথা মেনে নিতে পারতেন? আসলে কি জানেন, আপনার বুদ্ধির উপর আপনারই যাতে সন্দেহ হয়, সেজন্য ব্রহ্ম এবং জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব খাড়া করতে শ্রীমাকে আসরে আনা হয়েছে। ভক্তির আফিমে যতক্ষণ না বুঁদ হবেন, ততক্ষণ আপনাকে মুক্তি দেয়া হবেনা। আপনার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির কোনো দামই দেয়না যে ভক্তি। আপনার ধী-শক্তিকে যে নাকাল করে মারে।"

উত্তমা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—"আচ্ছা, এখন ছাড়ান দিন বইয়ের কথা। আপনি আমার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছেন। আজ আর অন্য কথা হবে না। কিন্তু আসুন না কাল দুপুরে আমার বাড়িতে। কৃপা করেই আসুন। দুপুরে চাকর আর দরোয়ান ছাড়া কেউ বাড়িতে থাকে না। শেঠজী ঐ সময় গদীতেই থাকেন।"

এরপরেও আমার নীরবতা লক্ষ্য করে সে বললে—"কেন আসবেন না? দোষ কি?

—"দেখি," জবাব দিলাম।

—"আসবেন, কাল দুটো নাগাদ। আসবেন কিন্তু। বাড়ি ত' চেনেনই।" উত্তমা সেদিন আমাকে বিদায় দিল।

ভেবেছিলাম যাবনা। হোটেল বেলা দুটোয় যখন নিঝ্‌ঝুম হয়ে আসছিল, তখনো ভেবেছিলাম, যাবনা। গিয়ে কী লাভ? উত্তমার অনুরোধটা উড়িয়ে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু অনুসন্ধিৎসা সহসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

রাস্তায় নেমে বাস ধরলাম। এক বাস থেকে আর এক বাসে চড়ে' প্রায় পৌণে তিনটে নাগাদ শেঠ চুনিলালের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাড়িটার তিনতলায় থাকেন চুনিলাল। অন্য তলাগুলোয় অন্যান্য ভাড়াটে থাকে। বম্বেতে যে-অর্থে সবাই শেঠ, সে অর্থে চুনিলালও শেঠ। শেঠজী যে বিরাট বড়লোক, তা মোটেই নয়। বম্বের এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার মাত্র। অন্তত আমার তো তাই ধারণা। চার্চগেটে চারখানি কোঠা নিয়ে থাকেন চুনিলাল। অবশ্যি, বড় বড় কোঠা।

তিনতলার মুখে দরোয়ান ঢুলছিল। আমার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে চোখ তুলে তাকালে।

শুধালেম—"শেঠেনী আছেন?"

"শেঠেনীকেই চাই?" প্রত্যুত্তরে ও শুধাল।

"হাঁ।"

বললে—"আপনি বৈঠকখানায় বসুন। একটু পরেই শেঠেনীকে ডেকে দেব।" এই বলে সে আমাকে একটি বসবার সুন্দর কোঠা

দেখিয়ে দিলে। তারপর চলে গিয়ে আবার ওর টুলে বসে ঢুলতে লাগল।

বৈঠকখানাটির তারিফ করতে হয়। এতদিন উত্তমার বাড়িই চিনতাম, কিন্তু ভেতরে ঢুকবার প্রয়োজন হয়নি। আজ বাড়িতে ঢুকে বৈঠকখানা দেখে ভারী ভাল লাগল।

কিন্তু উত্তমা কোথায়? তবে কি ঘুমিয়ে এখন? আসতে কি দেরী করলাম? আমার চিন্তাসূত্রকে ছিন্ন করে আওয়াজ এলো ও ঘর থেকে। সম্ভবত পাশের ঘর থেকে ঘুলঘুলি বেয়ে আওয়াজ এল। আওয়াজ নয়, কথোপকথন। কথোপকথন নয়, কথা কাটাকাটি। উত্তেজনা। উত্তমার কণ্ঠস্বর:

"বারবার এই নিয়ে চারবার আমাকে ডাক্তারেব কাছে যেতে হচ্ছে। তুমি কি আমাকে বাঁচতে দেবে না?"

—"তোমাকে আমি ভালবাসি উত্তমা। এবারেও বিপন্মুক্ত করে দেব তোমাকে।" পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ।

--"না, আমি মরতে চাই। না হয়, পালিয়ে যেতে চাই। কী খেলা তোমরা আমাকে নিয়েই না খেলছ?"

পুরুষ কণ্ঠ বললে—"তোমাকে টাকা পয়সা দিতে কার্পণ্য করছিনা। যা চাও, তাই তো পাও। তোমার শাড়ি-গয়নার অভাব নেই। তোমার গরীব মা-বাপ কল্পনাও করতে পারেন না, তুমি কত সুখে আছো।"

"ছাই। গরীব মা-বাপ আমাকে কৈশোরে বেচে দিয়েছিলেন বলেই এই হাল হয়েছে। আমি কাপালিকের পাল্লায় পড়েছি। গয়না আর শাড়ির মোহ এবার কাটাতেই হবে।"

"এ ঐশ্বর্যের মাঝখানে থেকেও তুমি কি সুখী নও উত্তমা?"

—"এ ঐশ্বর্য কার? এ ত' তোমাদের জিনিস আমার গায়ে উঠেছে। গয়না বল, শাড়ি বল।"

—"তবে তুমি কি চাও?"

—"আমি চাই আমাকে মুক্তি দাও। পারবনা তোমার লালসা মেটাতে। পারবনা তোমাদের কারবারের দালালী করতে। চুলোয় যাক তোমাদের লগ্নী কারবার। আমি পার্টি জুটিয়ে আনতে পারব না। বহুদিন আমাকে মাছের চার হিসেবে ব্যবহার করেছ তোমরা।"

—"কিন্তু তোমাকে আমি যে ভালবাসি।" পুরুষের আওয়াজ।

—"আমাকে নয়, ভালবাস রোজগারকে। ভালবাস রূপেয়া পয়দা করাকে।"

—"কিন্তু তুমি কি রূপেয়া ভালবাসনা?"

—"ভালোবাসতাম। যদি আমাকে দশের কাছে পণ্য করে দফায় দফায় আমার মাতৃত্বকে বিপন্ন না করতে—তবেই। আমার ঘেন্না ধরে গেছে। চুনিলাল অক্ষম আর তুমি লম্পট।"

"কিন্তু চুনিলালকে আমিই তো দেউলিয়া অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছি।" পুরুষকণ্ঠ বললে।

—"চুনিলালকেও আমি ঘৃণা করি।" বললে উত্তমা।

—"আমাকে?"

—"তোমাকেও ঘৃণা করি মুখার্জি। ঘরে তোমার বউ এবং ছেলেমেয়ে আছে। তুমি আমাকে মুক্তি দিয়ে বউয়ের কাছেই ফিরে যাও।"

উত্তেজিত কথাবার্তা পুরো দমেই চলছিল। আমি বৈঠকখানা ছেড়ে চোরের মত উঠলাম। পাছে মিঃ মুখার্জির চোখে চোখে পড়ি। দ্রুত নিচে নামতে লাগলাম। পেছনে দরোয়ান তাড়াতাড়ি নেমে

এল। তাকে জানিয়ে দিলাম যে, একটু পরেই আমি ঘুরে আসছি। ছুটতে ছুটতে রাস্তায় নেমে এলাম।

সন্ধ্যের পর চার্চগেটে একটি বেঞ্চে এসে বসলাম। শকুন্তলা আমাকে এখানে আজ আসতে বলেছিল। ঈষৎ অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে বসলাম। সমুদ্র থেকে খানিকটা তফাতে।

কিন্তু আমার যা আশংকা ছিল, তাই হল। এত ঘটনার পর এখানে সান্ধ্যভ্রমণে উত্তমা আসতে পারবে কি-না, সে সংপর্কে আমার সংশয় ছিল। আর সংশয়ের চাইতে বেশি ছিল আশংকা।

সেই আশংকা সত্যে পরিণত হল। তার প্রাতিদিনেব অভ্যাস মতন উত্তমা আজও এল সমুদ্রতটে। তবে সে আজ অধোবদনা। সমুদ্রের দিকে মুখ করে সে বসল।

আধঘণ্টা বাদেই এল শকুন্তলা। আগা, চলন-মন্থবা। ক্লান্ত পায়ে সে হেঁটে হেঁটে যখন প্রায় উত্তমার কাছাকাছি হয়েছে, তখনই তাকে লক্ষ্য করলাম প্রথম। না হলে, আগেভাগেই ডেকে সরিয়ে নিতাম।

আমি আজ ন যযৌ, ন তস্থৌ। উত্তমা যদি দেখে ফেলে! আজ আমারই লজ্জায় আমি হতবাক। কেন আমি উত্তমাব বাড়ি ঐ সময় গিয়েছিলাম? আর কেনই বা দুর্ঘটনার মত মুখার্জি বিনা নোটিশে এসেছিল?

শকুন্তলা আর উত্তমা পাশাপাশিই বসে আছে। দুজনেই পরস্পরের আগমন টের পেয়েছে। কিন্তু কেউ কারও সাথে কথা বলছেনা। একটি কথাও না।

দুটি দুর্ভাগা নারী।

দুজনেই ধনতন্ত্রের শিকার।

অথচ, এদের মাঝখানে তুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল। তুজনেই পরস্পরকে সন্দেহ করছে। তুজনেই চুপচাপ বসে আছে। চিনেও চিনছে না।

অথচ, ওরা তুজনেই মুক্তি চায়। ধনতন্ত্রের কবল থেকে।

সূর্যের অন্ধকার

॥ নয় ॥

নার্স এসে দেখে গেল রোগী ঘুমিয়েছে কি-না।

রোগী তখন হয়ত ঘুমিয়েছিল। নিঃশব্দে বাইরে এসে নার্স বললে, "অনেকক্ষণ দাপাদাপি করে ক্লান্ত এখন। মনে হয়, একটু ঘুমিয়েছেন। আপনি বরঞ্চ বিকেলে আসুন।"

"কিন্তু রোগ-নির্ণয়ের কি হল? ওটা কি মৃগী রোগ?"

নার্স বিনীতভাবে বললে, "বিকেলে এলেই জানবেন। এখনো বোধ করি রোগনির্ণয় হয়নি।"

খানিক নিঃশব্দে থেকে বললাম—"আমি কিছু ফুল নিয়ে এসেছিলাম। শাদা ফুল ও বড় ভালবাসে। তার শিয়রে ফুলগুলো সাজিয়ে দিতে পারেন?"

নার্স ফুলগুলো হাত বাড়িয়ে নিয়ে জিগ্‌গেস করলে—"রোগী আপনার কে হয়?"

ম্লান হাস্যে বললাম—"আমার পরিচিত ব্যক্তি। এক হোটেলেই আমরা আছি। আমি অবশ্য এদেশে থাকিনা। নানা দেশ ঘুরে বেড়াই। কিন্তু আমাদের পেশা এবং নেশা প্রায় এক।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আর কিছুই নয়। রোগী বাংলা দেশের এক পথভ্রষ্ট কবি।"

"ওঃ, সেজন্য অনেক বাংলা কবিতা কিছুক্ষণ আগেও তিনি আওড়াচ্ছিলেন।"

নার্স কথা কয়টি বলে হয়ত আমার চোখের দিকে চেয়েছিল। আমি তত লক্ষ্য করিনি। কিন্তু মুহূর্তে জলে ভরে এল আমার চোখ। এও এক কবি। যেমন ছিল সুকান্ত। সুকান্তের মত দেয়ালে দেয়ালে কবিতা না লিখে, এ শুধু জংগলে জংগলে কবিতা আবৃত্তি করে। গঞ্জের চালাঘরের নিচে একা একা বসে কবিতার পাদপূরণ করে। খাতাকলম নিয়ে কবিতা লেখার ফুরসুৎ কোথায়? যে-কলমে অনবরত কোম্পানীর টাকা পয়সার হিসেব কষতে হয়, সে-কলম দিয়ে কবিতার পাপড়ি ফোটাতে সে চায়নি।

"এখানে ওর কোন আত্মীয়ই নেই?"

"কেন, আপনারাইতো আছেন।"

আমার জবাবে সহসা নার্স হকচকিয়ে গেল। তারপর বললে "নার্স যে রোগীর বোনের মতন, সে কথা বহুদিন ধরে ভুলে গেছি। শুধু ট্রেনিং-এর সময় এরূপ কথা শোনানো হয়েছিল।"

"মনে কিছু করবেন না। কবি বড় নিরাত্মীয়। আপনিই ওকে দেখবেন।" কথা কয়টি বলে হাসপাতালের সিঁড়ি বেয়ে মাটিতে নামলাম। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম- "কাজের তাড়ায় যদি বিকেলে নাও আসতে পারি, আপনি কিন্তু ওকে দেখবেন।"

বেশিক্ষণ গেলনা। কবির ঘুম ভেঙে গেল। আস্তে আস্তে চোখ মেলে দেখলে, আশে পাশে যারা খাটের উপর বসে কিংবা শুয়ে আছে, তারা রোগীর মত। রোগীর মত কেন, রোগীই। শেষ পর্যন্ত প্রত্যয় হল এটা হাসপাতাল বলে। ঔষধের উগ্র গন্ধ ভেসে আসছিল মৃদু বাতাসে। কিন্তু শুয়ে শুয়েই কবি আবার ফুলের গন্ধ পেল। সহসা মনের ভেতর বিদ্যুতের মত সঞ্চারিত হল টাকার কথা। গত রাতের টাকা। কবি তার কোটের গোপন পকেটে হাত দিল।

পরমুহূর্তে অদ্ভুত প্রসন্নতায় ভরে উঠল অন্তর। না, গোপন পকেটে সেফটিপিন-মারা মনিব্যাগ ঠিকই আছে। খোয়া যায়নি।

নার্স এগিয়ে এল শিয়রের কাছে। ফুলগুলো এগিয়ে দিয়ে বললে—"আপনার হোটেলের এক চশমা-পরা বাবু এসেছিলেন। আপনাদের দুজনের পেশা এবং নেশা নাকি এক। তিনিই ফুল দিতে এসেছিলেন বেলা বারটায়। আপনি ঘুমিয়েছিলেন দেখে তিনি চলে গেছেন। বলেছেন, পারলে বিকেলে আসবেন।"

কবি চুপ করে কথাগুলো শুনল। পরে অসহায়ের মত শুধাল—"আমাকে বলুন না, আমার কি হয়েছে?"

নার্স রোগীর সামনে টুলটা পেতে বসল। নার্সেরও বয়েস বেশি নয়। তবু কর্তব্য পালন করতে সে যেন হুস্ করে চল্লিশ বছরের হয়ে গেল। বললে—"কিচ্ছু হয়নি। মাথা ঘুরেছিল বলে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর জ্ঞান হয়নি দেখে আপনাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে।"

"কিন্তু এখন তো আমার জ্ঞান হয়েছে। আমাকে ছেড়ে দিলেই হয়।"

"ডাক্তার আসুন তো বিকেল বেলা। ছেড়ে দেবার হলে নিশ্চয়ই আপনাকে ছেড়ে দেবেন।"

"সেই বিকেল পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে?" শুধাল কবি।

নার্স হাসল মনোহরণ হাসি। মাথা নেড়ে বললে—"ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি তো আছি। তারপরে কবির কানের কাছে মুখ ঈষৎ সরিয়ে এনে বললে—"আপনিও বাঙালী আর আমিও।"

নার্স চলে গেল অন্য কাজে। কবি বিছানা ছেড়ে উঠল। শরীর বড় দুর্বল। কিন্তু দুর্বলতার কথা প্রকাশ করলেই হাসপাতালে থাকতে হবে। বড় ভয় ওর হাসপাতালকে নিয়ে। সেলসম্যানের

হাসপাতাল-বাসকে কোম্পানী কদাচিৎ সুনজরে দেখে। বিশেষত কোম্পানীর টাকার হিসেব যখন পর্যন্ত সমজানো হয়নি।

নার্সের পরিত্যক্ত টুল সরিয়ে এনে কবি বসল জানালার কাছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় বিহারের রুক্ষ প্রকৃতিকে। জায়গাটা বিহারের। মাটি এখানে পরমাশ্চর্য। সহজে গলেনা, এমন কি বৃষ্টির পরেও। বালি ও পাথরে ভূস্তর শুধু পিংগল নয়, কঠিনও বটে। ঠিক কোম্পানীর খোলসের মত।

কবিয়াল নয়, আধুনিক কবি। বাঙলা দেশের ছেলে দৈববিপাকে এসে পড়েছে বিহারের এই হাসপাতালে। এখানে আসবার কোন কথাই তো ছিলনা। বিস্তীর্ণ দিগন্তের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের ইতিহাস হাতড়াতে লাগল কবি। ধনতন্ত্রের এক অখ্যাত ভগ্নদূতের মামুলি ইতিহাস শুরু হয়েছিল ক'লকাতায় আই-এ পাস করার পর থেকে যখন।

সম্প্রতি কোম্পানী তাকে বালেশ্বরের জংগল থেকে এ-তল্লাটে বদলি করেছে। বিখ্যাত এক দেশলাই কোম্পানীতে কাজ করে সে। বালেশ্বরে থাকতে শিমুলের কাঠ সংগ্রহ করত বনে বনে। কবি হয়ে পড়েছিল কাঠুরিয়া। তবু ফাল্গুনে শিমুলের পুষ্পিত বনে মাঝে মাঝে সে অস্থির হয়ে পড়ত। একবার ভাবত, কোম্পানীকে খবর দেবেনা এমন পুষ্পিত গাছের। গাছ তাহলে তারা কেটে নেবে কসাইএর মত। কিন্তু আবার সে অস্থির হয়ে পদচারণা করত। শিমুল সাধারণত একা জন্মায়না। এক পিতামহ-শিমুলের অজস্র বীজকে কত কালবৈশাখী এধার-ওধার ছড়িয়ে দেয়। তাতেই আশে পাশে শিমুলের তরুণ-গোষ্ঠী তৈরী হয়। যূথবদ্ধ শিমুল। তার নশ্বর কাঠ যাবে দেশলাইয়ের কারখানায়। গাছের আড়কাঠি হয়ে এসেছে কবি। গাছের যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকত। যদি বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারত গাছগুলি।

গাঁয়ের পর গাঁ ঘুরত কাঠুরিয়া। আর খুঁজত কোথায় সেই শাল্মলী মহীরুহ, যার অনাবৃত, অজস্র বাঁকাচোরা ডালে দূর থেকে দেখায় রাশি রাশি রক্তের ঢেউ। আদিমকালের রক্তক্ষরিত বিশালকায় জানোয়ারের মত।

সেই কবি-কাঠুরিয়া এবার ভোল বদল করল। কোম্পানী দিল তাকে নতুন কাজ। দেশলাই বেচার কাজ নিয়ে কবি এল পূর্ব-বিহারে। জংগলে জংগলে সাঁওতালীদের হাটে বেচতে হবে দেশলাই। কবি এল সাঁওতাল পরগণায়। উত্তর রাঢ়ের বীরভুম অঞ্চলের সংগে মিলিয়ে যার মাটির প্রকৃতি প্রায় এক হয়ে আছে।

তবু ভাল। কবির ভাল লাগে সাঁওতালদের। বরঞ্চ, বিহারের অনেক জেলাই তার ভালো লাগেনা। যেখানে একেবারেই ফুল ফোটেনা, একেবারেই সবুজ রঙ দেখা যায়না, এমন জায়গা কারই বা ভালো লাগে? দেহাতি গানের কলি ভাজতে ভাজতে অনাবৃত গাছের নিচ দিয়ে যায় যে রাধা, লছমী, দুর্গা প্রভৃতি দেবীগণ, তাদের চাইতে ভালো লাগে সাঁওতালী মেয়েদের। কবরী-বন্ধনে, নাচে এবং সর্বোপরি সুঠাম দেহের গভীর কালো রঙে কোথায় যেন জাতিগত সৌন্দর্য আছে।

সৌন্দর্যবোধটা ব্যক্তিগত। কিন্তু কালো রঙের উপরেই কবির একটা বিশেষ পক্ষপাত আছে। কারণ জিগগেস করলে কবি হঠাৎ আরক্তিম হয়ে উঠে। তার মনের আর্শীতে ভেসে উঠে একখানি মুখ। সে মুখের রঙ কালো।

কবি দেশলাই বেচে। পাইকারেরা এসে দেশলাই কিনে নিয়ে যায়। জামতাড়া কিংবা দুম্‌কার হাটে যখন হিলহিল করে সাঁওতালী মেয়ের কালো রঙ, তখন কবিকে দেখো, সে সস্তা দামের সিগারেট ধরিয়েছে এক জোড়া চোখ স্মরণ করে। আর যখন সারি সারি লণ্ঠন

কিংবা মশালের আলো এদিকে ওদিকে নড়তে শুরু করে, যখন রাজমহল বা তিন পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠে' পশ্চিমে পালামৌর দিকে চলতে শুরু করে চাঁদের আকাশী নৌকা, তখন ডুম্‌কার আশে পাশে কোন এক গঞ্জে ভাঙা বেঞ্চে বসে কবি স্মরণ করে সেই কালো মেয়েকে। আবার কখনো উবু হয়ে দেশলাই বিক্রীর পয়সা মেলায়। কোম্পানীর পয়সার প্রতি পাইগণ্ডা হিসেব দিতে হবে কোম্পানীকে।

পায়ের শব্দে চমকিত হয়ে উঠেছিল কবি। তাড়াতাড়ি চাপা দিয়েছিল কাগজের নোটগুলোকে। এ ত' কাল রাতেরই কথা। একেবারে কাছে এসে গিয়েছিল সাঁওতাল তরুণীটি। খোঁপায় তার এক স্তবক শাদা ফুল। লণ্ঠনের আলোতে কেমন মিষ্টি মনে হয়েছিল মুখখানি।

"একটা দেশলাই বেচবি বাবু, এই নে পয়সা।"

"না, না, খুচরো বিক্রী আমি করিনে। দোকানদারের কাছে যা।" আত্মসম্মানে ঘা লেগেছিল কবির। সে তো ছোট দোকানদার নয়। একটি বড় কোম্পানীর সেল্‌সম্যান। তাড়িয়েই দিয়েছিল মেয়েটিকে। গজগজ করতে করতে মেয়েটি চলে গিয়েছিল।

কবি বসেছিল আবার হিসেব মিলাতে। প্রতি পাই পয়সার হিসেব। যে হিসেবে ভুল হলে কোম্পানী মায়ামমতা করেনা। গোটা কোম্পানীটাই যেন অন্ধ কসাই, কিংবা নিষ্ঠুর কবন্ধ।

কিন্তু হিসেবে গোলমাল লেগেছিল তার। মানুষের মন তো। বয়স হয়েছে বত্রিশ তেত্রিশ। দশ বছর আগে ঢুকেছিল দেশলাই কোম্পানীতে। ভেবেছিল দশ বছরে যেমন করেই হোক, কিছু টাকা জমিয়ে ফেলতে পারবে। তারপর ক'লকাতায় বসে ঐ টাকায় কোন একটা স্বাধীন ব্যবসা করা। তখন আর গোলামি থাকবেনা। ঝেড়ে ফেলে দেবে দাসত্বের ছাই গা থেকে।

অথচ, দশ বছর তো দেখতে দেখতে কেটে গেল। একটি পয়সাও সে জমাতে পারেনি। একবার তার অসাবধানতায় তার জিম্মা থেকেই তিনশ' টাকা চুরি গেল। চুরি গেলে কোম্পানী কি ছাড়ে? কোম্পানী লিখে পাঠাল, সেই নাকি চোর। শেষে সম্মান বাঁচাতে মায়ের বিয়ের পুরাতন গয়না বেচে টাকার ব্যবস্থা করতে হল। পারিবারিক শেষ সম্বল দিয়ে রফা হল কোম্পানীর সংগে। সে ঘটনা ঘটেছিল বালেশ্বরে থাকতে।

তবু একটা স্বপ্ন ছিল। প্রদীপের সল্‌তের স্বপ্ন যেমন আলো, তেমনি তারও স্বপ্ন ছিল একদিন পদোন্নতি হবে। বছর বছর ধরে এই আশাই তাকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পদোন্নতি আজ অবধি তো হলনা। আর মাইনে যা' বাড়ে, তা বলার মত নয়। অথচ, আধপেটা খেয়েও কোম্পানীর সম্মান বজায় রাখবার জন্য প্যাণ্ট শার্ট পরে চলাফেরা করতে হয়। সময় রক্ষার জন্য হাতে হাতঘড়ি লাগাতে হয়। ওতে খরচ কত। বারে বারে খরচ আছে ধোপার, আর ঘড়ির খবচ আছে মেরামতির।

কিন্তু সকল স্বপ্নের সেরা এক স্বপ্ন। প্রতিদিন কাজের শেষে খাটিয়ায় শুলে যে-স্বপ্ন হৃদয়কে মধুর করে। ক'লকাতায় রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে থাকে অপরাজিতা। সাত বছর ধরে প্রতি ছুটিতে যাকে সে একই কথা শুনিয়ে এসেছে। সেই ভালবাসা এবং ঘরবাঁধার কথা। তাকে সে সেল্‌স-গার্লের একটি চাকরিও জুটিয়ে দিয়ে এসেছে। একটি দিশী কোম্পানীর তরল আলতা, সিঁদুর ফেরী করে অপরাজিতা। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গৃহিণীদের কাছে ফেরী। বিক্রীর উপর কমিশন আছে অপরাজিতার। তাতে নিজের শাড়ি, ব্লাউজ, হাতখরচের পয়সাটা উঠে যায়। তদুপরি সামান্য মাইনেও আছে মাসকাবারে।

সত্যিই তো। অনেক রাত হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সব নোট ও টাকা মনিব্যাগে পুরে' কোটের গোপন পকেটে রেখে দিল কবি। এবং প্রতিদিনের অভ্যাসমত সেফ্‌টি-পিন মেরে পকেট অল্প-বিস্তর শেলাই করে দিল। কোম্পানীর জিনিস কোম্পানীকে না-সমজানো পর্যন্ত ভারী দুশ্চিন্তা।

অতঃপর লণ্ঠন হাতে করে ডাকবাংলোর দিকে রওনা হয়েছিল কবি। কিন্তু শেষে কি হল, তা আর মনে নেই।

কবি ঘুমিয়ে পড়েছিল আবার।

ক্রমে বিকেল হল, সন্ধ্যে হল, রাত হল। তারা ফুটল আকাশে। দিনের রুক্ষতা গেল মিলিয়ে। শালের বনে মর্মরিত হল জ্যোৎস্না-সিক্ত বাতাস।

সন্ধ্যের খানিক আগে ডাক্তার এসেছিলেন। তখন রোগী ঘুমিয়েই ছিল। ডাক্তার নাড়ী টিপে অনুভব করেছিলেন, নাড়ীর স্পন্দন বড় দ্রুত। কিন্তু রোগী যখন ঘুমোচ্ছে, তখন ঘুমোক। ঘুমই সুস্থ করে তুলতে পারবে স্নায়ুকোষের অস্বাভাবিকতাকে। ঘুমই মস্ত ঔষধ।

জেগে উঠলে আবার যাতে ঘুম হয়, সেজন্য ঘুমের বড়ির ব্যবস্থা করে তিনি চলে গেলেন।

মফঃস্বল শহরের হাসপাতাল। একটু রাত হলেই নিঝুম হয়। একটু রাত হলেই আধাজীবন্ত রোগীগুলি ঝিমিয়ে যায়। অসময়ে প্রবেশাধিকার নিয়ে তেমন কড়াকড়িই বা আর কোথায়? আর হাসপাতালের আনাচ কানাচ আমি চিনি। গেটে সেই প্রকাণ্ড শালগাছ। অপারেশন-থিয়েটারের সামনে ঝাকড়ামাথা প্রাচীন নিম। লনের বুক চিরে লাল পথ। নার্সরা খটখট করে যখন ঐ পথ দিয়ে

হাঁটে, তখন রোগীর রোগযন্ত্রণা বেড়ে যায়। অপারেশনে ঢুকবার আগে ডাক্তারদের হাসির যখন উচ্চরোল উঠে বারান্দায়, তখন বলির পাঁঠার মত রোগীর হাত-পা সেঁধিয়ে যায়। পুঁযের গন্ধে যখন বাতাস গুমোট হয়ে উঠে, তখন ভিন্ন ওয়ার্ডের রোগিনীরা ফুলগন্ধী দিবাস্বপ্ন দেখে। দাইরা যখন ফিসফিস করে কথা বলে, তখন গর্ভিণীর উৎকণ্ঠা সহস্রগুণ বেড়ে যায়।

অথচ, হাসপাতালটির আনাচে কানাচে ফুল নেই। ঔষধ আর পুঁযের উগ্র গন্ধ দূর করতে হলে হাসপাতালের সর্বত্র যে-জিনিসটির অকৃপণ চাষ চাই, সেটিই এ-হাসপাতালে কারো মাথায় খেলেনা। রোগী-রোগিণীরা তাই সারাক্ষণ চোখের সামনে যে-ফুল দেখে, সে হল সর্ষে ফুল।

একটু রাত হয়েছে বৈকি। তবু দুখানি চিঠি এসে হোটেলে পড়ে রয়েছিল। একখানি কোম্পানীর রসমাধুর্যহীন চিঠি। অপরখানি নীলরঙের মলাটে অর্থাৎ খামে ঢাকা। চিঠি দুখানি দেবার জন্য শাল গাছটার নিচ দিয়ে হাসপাতালে ঢুকলাম। দুখানিই কবির চিঠি। হয়ত' জরুরী চিঠিও হতে পারে।

"জেনারেল ওয়ার্ডের ষোল নম্বর বেডের রোগী কেমন আছে?" মন্থরগমনা একটি নার্সকে প্রশ্ন করলাম।

"আমি জানিনে। আমি অন্য ওয়ার্ডের" বলে নার্সটি পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আর একটি নার্স এ পথ দিয়েই আসছিল। তাকে জিগগেস করলাম, "জেনারেল ওয়ার্ডের ষোল নম্বর বেডের রোগী কেমন আছে, বলতে পারেন?"

"তিনি ঘুমিয়ে আছেন।"

ঘুমিয়ে আছেন, শুনে চকিতে একবার ভাবলাম, চিঠি দুখানি

একেই দিয়ে যাই। কবি যদি রাতে জাগে, তবে দিয়ে দিতে পারবে। আর একবার ভাবলাম, নার্সের দায়িত্বে বিশ্বাস নেই। নানান কাজের ঝামেলায় ভুলেই যাবে চিঠির কথা। তার চাইতে বরং কাল একবার নিজেই এসে দিয়ে যাব।

নার্সের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, "ধন্যবাদ। আপনাকে আর কিছুই করতে হবেনা।"

লম্বা পা চালিয়ে গেটের সেই শাল গাছটার কাছাকাছি প্রায় যখন এসে পড়েছি, তখন পিঠের উপর কারো হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম।

ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে দেখি, আলুথালু বেশে কবি। পরনে হাসপাতালের ডোরাকাটা পায়জামা। মুখে চাপ চাপ দাড়ি। কোটরাগত চোখ। গেটের সামনে অনুজ্জ্বল যে-আলো জ্বলছে, সেই আলোর ম্লান ধারায় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল আগন্তুকের মুখ।

"জানলা দিয়ে আপনাকে দেখে আমি বেড ছেড়ে উঠে এসেছি।" উত্তেজিত কণ্ঠে বললে কবি। "বিশেষ কোন প্রয়োজনেই এত রাতে আপনি এসেছিলেন।"

আমি মাথা নাড়লাম। ওর চিবুক নাড়া দিয়ে বললাম -- "শুধু দুটো চিঠি দিয়ে চলে যাব বলেই অসময়ে হাসপাতালে এসেছিলাম।"

"চিঠি ? দেখি, কোথায় চিঠি।"

কোম্পানীর খামের নিচে নীল খাম রেখে দুটি চিঠিই ওর সামনে ধরলাম।

ছোঁ মেরে চিঠি দুখানি ও হাতে নিল। বললে—"একটু দাঁড়ান, চট করে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি।"

প্রথমেই সে তুলে ধরল নীল খামখানি। ওর চোখের উপর এক ঝলক আনন্দ শিহরিত হয়ে গেল মুহূর্তে। যেন এ চিঠির জন্যই সে হাসপাতালের শয্যা ছেড়ে চুরি করে পালিয়েছে।

কিন্তু খোলার সময় দেখা গেল, কোম্পানীর খামখানিই প্রথমে ছিঁড়ছে। জীবনের বিবি যেন হার মানল জীবিকার টেক্কার কাছে এই মুহূর্তে আর একবার।

কোম্পানীর চিঠি পড়তে পড়তে হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে এল কবির। ঠোঁটের উপর দাঁতের দংশন শুরু হল। কয়েকটি কথার ফুল নয় যেন হুল এসেছে কোম্পানীর কাছ থেকে।

"শালারা পাগল করে মারল।"

"কি হয়েছে ?" জিগগেস করলাম।

"আর বলবেন না।"

কিন্তু, কথা বলতে বলতে সহসা উন্মনা হয়ে গেল কবি। ক্ষিপ্তের মত কোমরে হাত দিল। সেখান থেকে দ্রুত হাত সরিয়ে এনে বুক-পকেটে হাত রাখল। বুক-পকেটেও নেই। তবে কোথায় গেল টাকার থলি ? নিমেষে মুখখানি তার রক্তশূন্য হয়ে গেল। মড়ার মুখের মত ।

পরমুহূর্তে সে ছুটল জেনারেল-ওয়ার্ডের দিকে। ছুটতে ছুটতে সে বললে -"দাঁড়ান, যাবেন না যেন।'

নিমেষে মিলিয়ে গেল দ্রুত ধাবমান কবির ছায়া। হাসপাতালের অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল কবি জেনারেল ওয়ার্ডে ঢুকে পড়েছে।

উত্তেজনাময় বেশ কয়েকটি মিনিট। জায়গা ছেড়ে নড়ব কি-না, ভাবছিলাম। এমন সময় দেখি কবি ফিরে আসছে। পেছনে পেছনে আসছে নার্স।

কবি ঘুরে দাঁড়িয়ে নার্সকে বলল—"দোহাই আপনাদের। জ্বালাতন করবেন না। আমি এখুনি আসছি।" নার্স আর এগোলনা। কিন্তু রোগীর দিকে লক্ষ্য রেখে জেনারেল-ওয়ার্ডের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল।

কবি ফিরে এসে বললে—"পেয়েছি। বালিশের তলায় আমার শার্ট রেখে এসেছিলাম। তাতে কিছু টাকা ছিল কোম্পানীর। ভেবেছিলাম, টাকা হয়ত' চুরি গেছে। চুরি গেলে কী-সর্বনাশই না হত।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন খানিক বুঝলাম। কিন্তু কথা বললাম না।

ঈষৎ স্বস্তিতে এবার নীল খাম খুলল কবি। বেশি নয়, মেয়েলী হাতে লেখা কয়েকটি ছত্র। পড়তে সময় গেলনা তেমন। যদিও পড়তে পড়তে ফ্যাকাশে হল কবির চোখ।

চিঠি পড়া শেষ করে কবি বললে—"আপনাকে ধন্যবাদ দিই দাদা। এত কষ্ট করে এমন অসময়ে চিঠি দুটো আপনি নিয়ে এসেছিলেন।"

"হয়ত' জরুরী চিঠি হতে পারে ভেবেই না অসময়ে এসেছি। কিন্তু, এখন আমি যাই। রাত অনেক হল।" এই বলে শাল গাছের নিচে কবিকে ছেড়ে দিলাম। উভয়েই বিপরীত দিকে খানিকটা এগিয়েছিলাম। এমন সময় শুনি আবার ডাক।

"একটু শুনুন ভাই।"

পেছন ফিরে আবার শাল গাছের নিচে এলাম। কবিও তখন গাছের নিচে এসে পৌঁছেচে।

আমতা আমতা করে ও বললে—"বড় দুর্ভাবনায় পড়েছি। চিঠিটা পড়ে গোলমাল বেঁধে গিয়েছে। কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিনে।"

"কিসের দুর্ভাবনা?" প্রশ্ন করলাম।

"বলবার জন্যই তো আপনাকে ডেকেছি, কিন্তু আগে কথা দিন, আমাকে পাগল ভাববেন না, কিংবা বখাটেও ভাববেন না।"

"কথা দিলাম।"

"আচ্ছা বলুন তো, চাকরি বড়, না বিয়ে বড় ?"

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা।"

"কিছু না বুঝেই বলুন না, চাকরি না প্রেম, কোনটা বড় ?"

"সম্ভবত কোনটাই বড় নয়।" আমি উত্তর দিলাম।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে কবি বললে – "বিষম সমস্যায় পড়েছি নীল খামখানা পেয়ে। ওতে অপরাজিতা বলে একটি মেয়ে আমাকে জানিয়েছে যে, বাজার মন্দা বলে তার সেল্‌সগার্লের চাকরিটা হঠাৎ কোম্পানী কেটে দিয়েছে। অপরাজিতা আমার কাছে এখন চলে আসতে চায়। আমার টেলিগ্রামের অপেক্ষা করে আছে সে। কিন্তু আমি তাকে এনে কোথায় রাখি ? থাকি হোটেলে। আর এখন তো হাসপাতালেই। তাছাড়া বিয়েও তো হয়নি আমাদের এখনো। আমি কি করি বলুন তো ?"

"এখন কোনমতেই ওর আসা চলেনা।" উত্তর দিলাম।

"ঠিক বলেছেন। আমিও তাই ভাবছিলাম। কালই টেলিগ্রামে জানিয়ে দেব যে, আসা কোনমতেই চলবেনা।" বলল কবি।

এর পরের দিন হাসপাতালে আমার যাওয়া সম্ভব হলনা। নিজের কাজের তাড়ায় যেখানে স্রোতের শ্যাওলা হয়ে ঘাটে ঘাটে ভাসছি, সেখানে দু'দণ্ডের অবসর কোথায় ? তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে আমাকে আর এক শহরে চলে যেতে হবে। সুতরাং, কাজের তাড়ায় আর সময় করে উঠতে পারলাম না।

তার পরের দিন, অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনের বিকেলে। নিজের কাজে একটু বিরতি দিয়ে বিকেলে রওনা হলাম হাসপাতালের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে এলাম সেই শাল গাছের নিচে। ভাবছিলাম কবির কথা। এ-যাত্রা হয়ত, হাসপাতাল থেকে তাড়াতাড়িই খালাস পাবে

কবি। কিন্তু যে-রক্তাল্পতা রোগ হিসেবে কবিকে আক্রমণ করেছে, তার থেকে সুস্থ হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সময়ে ঔষধ না-পড়লে মজানদীর মতন একদিন ছেলেটি শুকিয়ে যাবে। অথচ, তাকে সুস্থ করে তোলার কোন ব্যবস্থাই তো নেই।

কোনদিন দেখিনি, তবু শুনেছি তিনি আছেন। কল্পনায় ভেসে উঠল ক'লকাতার কোন এক গলিতে কবির মায়ের প্রতিবিম্ব। চেহারা তার দেখিনি। তবু পরিচিত হাজার মায়ের চেহারা মন্থন করে তাঁর চেহারা যেন খুঁজে পেলাম। সারস পাখীর মতন করুণ তাঁর চোখ। পাহাড়ীয়া সরোবরের মত নির্জনতা এবং নিঃসংগতা সে-চোখে। তাঁর যে-গয়নাগুলো বেচে কোম্পানীর দেনা শোধ করেছে কবি, সে শূন্যস্থান আর পূর্ণ হয়নি। যেন ভাঙা দেয়াল ঠেস দিয়ে তিনি অবুঝের মত আবহমান কাল ধরে বসে আছেন। ছেলের জন্য কিছুই করার তাঁর ক্ষমতা নেই। তাঁর হাত একেবারে শূন্য। তিনি মধ্য বিংশ-শতাব্দীর নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মা। মায়ের গয়না-বেচার কথা কবিই আমাকে বলেছিল।

"মনে মনে আপনাকেই খুঁজছিলাম। এই যে আপনি।"

হঠাৎ কল্পনার দড়ি ছিঁড়ে গেল। চেয়ে দেখি সেই নার্সটি, প্রথম দিন যার হাতে কবির জন্য ফুলের তোড়া দিয়ে বলেছিলাম, রোগীকে যেন আত্মীয়ের মতন দেখাশোনা করা হয়।

"কেমন আছে আপনার রোগীটি ?" প্রশ্ন করলাম ঔৎসুক্যে।

সে যেন খানিকটা আশ্চর্য হয়ে বলল—"আমিওতো আপনাকে এ প্রশ্নই করব বলে ভেবেছিলাম।"

"তার মানে ?"

"আজ সকাল থেকে তিনি আর হাসপাতালে নেই।"

"আপনারা বুঝি ডিস্‌চার্জ করে দিয়েছেন ?"

"না, না, ডিস্‌চার্জ করা হয়নি। আজ সকাল থেকে তাঁকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছেনা।"

"বলেন কি ?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"সত্যি বলছি, তাঁকে খুঁজেই আমরা পেলামনা।"

"কিন্তু আমরা তো একই হোটেলে থাকি। হোটেলে তো ও ফিরে যায়নি।

"কী আশ্চর্য, তবে কোথায় গেলেন ? ডাক্তাররা বলছিলেন, ব্লাডপ্রেশারের গোলমাল রয়েছে ওঁর।"

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বাঙালী নার্স বলে এই বিদেশে বাঙালী রোগীর জন্য সেই কেবল দরদ পোষণ করছে। অন্য নার্স সম্ভবত এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন মনে করছেনা। নার্সটি বললে —"তিনশ' টাকার একটা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার তিনি তাঁর মার কাছে কাল পাঠিয়েছেন। হাসপাতালের পিওন ঐ মনিঅর্ডার কাল করে এসেছে।"

"আর কোন টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে কোথাও ?"

"যতদূর জানি, তেমন কিছু পাঠাননি।"

"আপনার সংগে অন্য কিছু আলাপ হয়েছ ওর ?"

"না, শুধু মার কাছে মনিঅর্ডারের কথাই বলেছিলেন। এবং টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা আমিই করে দিয়েছিলাম।" নার্সটি বললে।

"তবে আমি যাই।" নার্সের চোখে চোখ রেখে বললাম।

"রোগীর খবর পেলে আমাকে জানাবেন। বাপরে, হাসপাতালে শুয়ে থাকতে ওঁর এত ভয়।" নার্সটি বললে।

সেখান থেকে বেরোলাম। ছাড়িয়ে এলাম গেটের দীর্ঘকায় শালগাছটি। সন্ধ্যের আর দেরী নেই। আবার ফুটতে শুরু করেছে ঝিলমিল তারা আকাশে।

চলতে চলতে ভাবলাম, কোথায় খুঁজব কবিকে? ওর দেশলাইয়ের যে অফিস আছে এ শহরে, তা আমি চিনি। কিন্তু সেখানে যাওয়াও এক মুশকিলের ব্যাপার। টাকা পয়সার গোলমাল থাকতেও তো পারে। আর হোটেলে তো সে যায়নি। হোটেলেও ওর দেনা আছে।

পথে পথে নয়, সেদিন প্রায় সারারাত মনে মনেই খুঁজলাম ছেলেটিকে। জীবনে মাঝে মাঝে এমন রাত আসে, যখন কোন নিরুদ্দেশের উৎস ধরে আকাশপাতাল ভাবনা শুরু হয়। ছেলেটি তাহলে মায়ের ঋণ শোধ করেছে। মা কি আবার গয়না কিনবেন? এক সংগে অত টাকা তো কোনদিন ছেলে পাঠায়নি। মার কি তবে মনে সন্দেহ জাগবেনা?

পরদিন সকালের ডাকে চিঠি পেলাম। চিঠি আমাকেই লেখা হয়েছে। চিঠি লিখেছে কবি।

'শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাটাই বড় হল। চাকরি আর প্রেম, দুটোকেই ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি। কোম্পানী আমার নামে হয়ত' ওয়ারেণ্ট বের করবে। কারণ, কোম্পানীর টাকা আমি ফিরিয়ে দিইনি।

অপরাজিতাকে টেলিগ্রাম করা হলনা। সমাজের যে কাঠামোর ভেতরে আমি বাস করছি, তার ভেতর প্রেম সুস্থ হতে পারেনা। অন্তত আমার মত বিড়ম্বিত সেল্‌সম্যানের জীবনে প্রেম কেবলই বিকৃত।

তাই বলে আমি যেমন চোর নই, তেমনি নৈরাশ্যবাদীও নই।

মায়ের গয়নার ঋণ শোধ করলাম, এবং কোম্পানীকেই চাকরি প্রত্যর্পণ করলাম। আপাতত, আমি মধ্যভারতের দিকে ভাগ্যান্বেষণে চলে যাচ্ছি, ইতি।'

চিঠি পাওয়ার পরদিনই ক'লকাতায় আমি চলে আসি।

তারপর কতদিন যে চলে গেছে। কিন্তু কবিকে আর দেখিনি। ভারতের উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, কোথায় যেন সে হারিয়ে গেছে। বহুদিনের স্ফুটিত প্রেমকে রাতারাতি বিকৃত প্রেম আখ্যা দিয়ে কোথায় সে সরে পড়েছে।

আর অপরাজিতা? হ্যারিসন রোডে কিংবা বড়বাজারে মাঝে মাঝে যখন কোন সেল্‌সগার্লকে দেখি, তখন মনে হয়, একবার নাম জিজ্ঞাসা করি। 'চাই তরল আল্‌তা'র চাকরিটা গেলেও অন্য কোন চাকরি নিশ্চয়ই এতদিনে মিলেছে। সম্ভবত কবি তার সংগে গোপনে আগের মতই যোগাযোগ রেখে চলেছে। সুদূর কর্ণাটক কিংবা মালাবার উপকূল থেকে চিঠি লিখছে এখনো। এখনো বিয়ের আশা ছাড়েনি।

আবার কল্পনা করি, অপরাজিতার বিয়ে হয়েছে অন্য কারো সংগে। ঘূর্ণ্যমান অনন্ত বিশ্বের কণাংশের কণা একটি মেয়ের প্রেমের কি মুল্য সৌরজগতের কাছে? প্রেম কেবলই উন্মাদনা, তার বেশি নয়। বিয়ে করে সে স্বস্তি পেয়েছে। সুখী ততটা নাই বা হোক।

আর অপরাজিতার বিয়ে যদি না হয়। নাই বা হল। মধ্যবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে হাজার হাজার অবিবাহিতা মেয়ে আছে। অপরাজিতা তারই একজন

ছায়াম্লান, স্যাঁৎস্যেঁতে কোন এক বিবর্ণ গলির ভেতর এক প্রাচীন গৃহে একটি ময়লা শয্যায় সে এইমাত্র জেগে উঠেছে। জেগেও সে অনুভব করছে তার সমস্ত মগজ জুড়ে' দুঃস্বপ্নের ক্লান্তি।

অথচ, সে ঘুমিয়ে পড়ার আগে কত আশায়ই না তরল আলতা ফেরী করতে দুপুরে বেরিয়েছিল। কতবার ক্লান্ত কণ্ঠে গৃহিণীদের কাছে সিঁদুর নেবার জন্য আবেদন জানিয়েছে। কেউ নিয়েছে,

কেউ নেয়নি, কেউ মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

অপমানে সে তখন মাটির সংগে প্রায় মিশে গিয়েছিল। তার ফেরীওয়ালীর জীবন মুহূর্তে তাকে বেত্রাঘাত করেছিল। অথচ উপায় ছিল না। এক নতুন 'তরল আলতা' কোম্পানীতে নতুন চাকরি নিয়েছে যে সে।

শ্রান্ত হয়ে নিজের গলিতে নিজের বাড়িতে সে ফিরে এসেছিল। ফর্সা শাড়ি, ফর্সা ব্লাউজ, এ-গুলো না খুলে' শোবার কথা নয়। কিন্তু সবশুদ্ধ, ম্যায় ভ্যানিটি ব্যাগ পর্যন্ত নিয়ে সে শুয়ে পড়েছিল। চোখ গিয়েছিল ঘুমে জড়িয়ে।

প্রথম স্বপ্নের আমেজ কী মধুর। সে নিজেকে দেখছিল বন্দিনী নবাব-নন্দিনীর মত। এক দুর্গের গবাক্ষে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল শাহজাদার জন্য। প্রিয়দর্শন শাহজাদা তার মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে করতে আসছে।

কিন্তু দ্বিতীয় স্বপ্ন? সে নিজেকে দেখল দাসীকন্যার মত। তার দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে বাদ্‌শা প্রেরিত এক ভীষণ-দর্শন জল্লাদ। বেরোবার কোন পথই দেবে না।

"আমার পথ ছেড়ে দাও," প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল অপরাজিতা। কিন্তু ঘুমের মধ্যে কোন আওয়াজই বেরোলনা।

"তোমার মুক্তি নেই," সেই ভীষণ-দর্শন লোকটি প্রত্যুত্তর করল।

"কেন?" চীৎকার করল অপরাজিতা।

"মুঘল হারেমে বাস করে মুসাফিরের সংগে প্রেম, বাঁদীর এ বেহায়াপনা আমরা সহ্য করতে পারি না।" জবাব দিল জল্লাদ।

"আমার কি মুক্তি নেই?" স্বপ্নে আলুলায়িত-কুন্তলা বাঁদী ডুকরে কেঁদে উঠল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের চীৎকারের প্রাণপণ যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে গেল অপরাজিতার।

কোথায় জল্লাদ? এ যে তার নিজের বাড়ি। যে-বাড়ির ভাড়া দেয়া হয়নি দু'মাস ধরে। সেই তাব পরিচিত জানলা, যেখানে দাঁড়ালে রাস্তার ডাস্টবিনের কাছে কাকের জটলা রোজই চোখে পড়ে।

অপরাজিতা চোখ রগড়াতে রগড়াতে ভাবতে লাগল, স্বপ্নে কী মুক্তি চেয়েছিল সে? আর জেগে কী মুক্তি চায়? জল্লাদ কি তবে ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রেরই প্রতীক?

ফুলের মত মুখ

॥ দশ ॥

পথের শেষ নেই।

ক'লকাতার গলি থেকে বেরিয়ে আমি যে কত পথ ঘুরেছি। জলে, স্থলে, আকাশে আকাশে পথ। দিনরাত সে পথে পথিকেরা চলে। শুধু একমাত্র ভারতেই কত পথ। বিদেশের কথা ছেড়েই দিলাম। পায়ে হেঁটে, রেলে, নৌকয়, জাহাজে, বিমানে, দিবারাত্র লোক চলছে।

আর পথে বেরোলেই পথের হাতছানি। পথের দুধারে ছড়িয়ে আছে জনপদের নরনারী। পা থেকে চুল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে নানা ভংগিমা। কথা বুঝি না। তবু মনে হয়, চেনা চেনা ওদের জীবন।

খাণ্ডোয়া থেকে ইন্দোর অবধি রেলপথ। পথে পড়ে নর্মদা নদী। নর্মদা পেরোলেই মনে হয়, এ কোন প্রাচীন জমিতে এলাম। মাথায় কনককুম্ভ চাপিয়ে মেয়েরা চলছে জল আনতে। আকাশের রঙ নীল। গ্রামের রঙ সবুজ। চিনি, যেন সমস্ত প্রাচীন জমিটাকেই চিনি। মগজে ঘুরপাক খায় মেঘদূত। ইন্দোর ছাড়িয়ে উজ্জয়িনী আর কতদূরে? কতদূরে রেবা নদী? রেল গাড়ীতে বসে বসে স্বপ্ন দেখি সে-যুগের দশার্ণ গ্রামের।

রেল গাড়ীতে বসে বসেই আবার দেখি এ-যুগের বিশীর্ণ গ্রাম। অভাবে কালি পড়েছে গাঁয়ের চোখে। ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে

কিশোরীর রক্তাল্প দেহ। চোখ গর্তে ঢুকেছে। একদা আষাঢ়ের মেঘ দেখে যে-জনপদবধূর লোচন প্রীতিস্নিগ্ধ হয়ে উঠত, তা এখন ভয়ে বিহ্বল হয়। ঘরের চাল কতকাল ধরে সংস্কার করা হয়নি। বৃষ্টি এলে ফুটো চাল বেয়ে কালনাগিনীর মত বৃষ্টি নামবে। দুধের বাচ্চাকে দংশন করবে বৃষ্টি। সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া হবে।

যতটুকু ফুলে ফলে ভরা প্রকৃতি, ততটুকু চিরকাল সুন্দর। নদীর জলে মেঘের ছায়া, আকাশের বুকে পাখীর ঝাঁক, দিগন্তে তুলি-আঁকা পাহাড়—এ সমস্ত দৃশ্য চিরকাল রমণীয়। কিন্তু মানুষের মুখের দিকে চেয়ে দেখো। এক রাজকন্যার চোখে আলো, কিন্তু হাজার দাসকন্যার চোখে কালো, কালিমা, কান্না। আর দাসকন্যারা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। বজবজ থেকে বাটানগর, হাওড়া থেকে হুগলী, কলিয়ারী থেকে অভ্রের খনি, আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্য—ছড়িয়ে আছে দাস, ছড়িয়ে আছে ইয়োর অবিডিয়েন্ট সারভেন্ট।

না, আমার বলা ঠিক হলনা। চাকরের কর্ম বুঝাবার জন্য কর্ম অর্থে-ই প্রত্যয় যোগ দিয়ে চাকরি শব্দ তৈরী হলেও আজকাল অবস্থা পালটেছে। আজকাল বহ্নি ধূমায়িত কিংবা প্রধূমিত। অথবা, বহ্নি চমকিত। সে ব্রিটিশ আমল নেই। সেপাই বিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্ণ হবার আর দেরী যেমন নেই, তেমনি আসমুদ্র হিমাচলে দাসরাও ভাবছে, আমাদের অর্থ নৈতিক মুক্তিরও আর দেরী নেই।

কিন্তু আর কতকাল এ রকম করে চলবে? দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের মনে কেবল ঘুরপাক খায় একই প্রশ্ন। তদ্দিনে কি আমরা মরে যাব? আমরা বেঁচে থাকতে সুখের নাগাল পেয়ে যাবনা? প্রশ্ন করেন ব্যাংকের বুড়ো কেরানী, ইস্কুলের সংস্কৃতের প্রবীণ পণ্ডিত।

কিন্তু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর রচনা করে তাদের সন্তানোপম তরুণেরা। দেখি, চাষীর মিছিলের নায়িকা কমলা আমারই পড়শীর

কলেজে-পড়া মেয়ে। সভায় যে বক্তৃতার আগুন জ্বালাচ্ছে, সে আমারই পাড়ার শান্ত ছেলে।

আশ্চর্য, সব বদলে যাচ্ছে। কে জানে কি হবে? এখানেও সেই পথ। গোষ্ঠীর সুখকে আয়ত্ত করতে হলে রাজনীতির একটা পথ বেছে নিতে হবে। আর পথে বিঘ্নও প্রচুর।

রাজনীতির কথা মনে এলেই মাঝে মাঝে বনেলীর কথা মনে হয়। ও ছিল মিরি কিংবা মিকির জাতের মেয়ে। এক কথায় পাহাড়ী। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। রঙ ফর্সা। ছোট ছোট চোখে কী আশ্চর্য সরলতা।

ওকে প্রথম দেখি ডিব্রুগড়ে। এক বন্ধুর সংগে ব্রহ্মপুত্রের তীরে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন ছিল রোববার। ব্রহ্মপুত্রের তীরে প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চের কাছে ঘাসের উপর বসে রয়েছিল সে। চৈত্র মাসের তখন অপরাহ্ণ। অবশ্যি, সে-চার্চটা পরের ভাদ্রমাসে ব্রহ্মপুত্রের গ্রাসে তলিয়ে যায়।

বনেলীকে দূর থেকে দেখে আমার বন্ধু উল্লাসে চীৎকার করে উঠল—"হ্যাল্লো"।

উত্তরে হাসি মুখে রুমাল নাড়াতে লাগল মেয়েটি। ওর হাসি মুখের উপর পড়ন্ত সূর্যের আলো। ঘাসের ভেতর অপূর্ব সুন্দরী দেখাচ্ছিল ওকে।

আমাকে টেনে টেনে বনেলীর কাছে নিয়ে গেল বন্ধুটি। তারপর বনেলীর কাছাকাছি বসিয়ে দিয়ে যেন বিস্ময়ে আমাকে শুধালে—"কি সত্যিই বনেলীকে চেনেন না?"

এই প্রথম শুনলাম, নাম বনেলী। এই প্রথম দেখলাম বনেলীকে। কি করে চিনব তাকে? আর বনেলীরও আমাকে চেনার কথা নয়।

বনেলী শুধু হাসছিল। সম্ভবত ও বাংলা জানে না। তবু বন্ধুটির দৌরাত্ম্য খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েই হাসছিল।

কথাবার্তা শুরু হল ইংরাজীতে। বন্ধুটি যেন আমার অস্তিত্ব ভুলে গেল কিছুক্ষণ। কেননা, মেয়েটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল জাগ্রত করে' কৌতূহল নিরসন করাও তার উচিত ছিল। মেয়েটির অসামান্যতা কোথায়, এটুকু জানতে আমি উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু বন্ধুটি ততক্ষণে আলাপে জমে গেছে। বনেলীকে সে শুধাল—"কতদিন থাকবে ডিব্রুগড়ে ?"

—"কিছুই ঠিক নেই।"

—"এর আগে কোন শহর হয়ে এলে ?"

- -"তেজপুর।"

"এখানে একলা বসে আছ যে ?"

মুহূর্তে দেখলাম, লাল হয়ে উঠল বনেলীর মুখ। একটা লজ্জা কিংবা আবেশ সঞ্চারিত হল ওর গালের রঙে। ও একটু ইতস্তত করে জবাব দিল—"এক জনের জন্য অপেক্ষা করছি এখানে।"

– "কে সে ?" বন্ধুটি বোকার মত শুধালে।

—"নাম নাই বা শুনলে," বনেলী যেন আড়ষ্ট ভাবে জবাব দিল।

বন্ধুটি সহসা চতুর হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে – "তাহলে আমরা যাই। ডিব্রুগড়ে যখন আছো কিছুদিন, তখন দেখা হবেই।"

বনেলীও যেন বিদায় দিতে উঠে দাঁড়াল। দু'জনের করমদন করে হাসি মুখে বললে "গুডনাইট"।

বনেলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নদীর পাড় বরাবর সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। বন্ধুটি যেন কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল। নীরবে আমরা পথ হাঁটতে লাগলাম। বেশ কিছুদূর এসে বন্ধু বললে -"আজো মেয়েটিকে চিনতে পারলাম না।"

—“চেনার কথাও নয়।” টিপ্পনী কাটলাম।

বিদ্যুৎগতিতে ঘাড় ফিরিয়ে বন্ধুটি শুধালে—“তার মানে?”

“আপনার মনের ধর্ম আর ওর মনের ধর্ম এক নয়।”

“ঠিক বলেছেন,” বন্ধুটি উৎসাহিত হয়ে সায় দিলে।

আরো খানিকটা পথ নীরবে আমরা হেঁটে এলাম। বসন্তের হাওয়া বইছে শোঁ শোঁ করে। আকাশে সূর্যাস্তের রঙ ফলতে শুরু করেছে। নদীর ওপারে হিমালয়েব উঁচু নিচু বাঁকাচোরা দেহ ক্রমেই অস্পষ্ট আলোয় মিইয়ে যাচ্ছে।

বন্ধু বললে—“তাছাড়া কালে ভদ্রে ওকে দেখি। আগে রাজনীতি করতাম, এখন পেটের দায়ে কাঠের কারবার কবি'। রাজনীতি থেকে সরে এসেছি। ও এখনো বামপন্থী রাজনীতিই করে।”

“কোথায় ওর সংগে আপনার প্রথম পরিচয় হয়?”

“গৌহাটিতে। সে প্রায় সাত আট বছর আগে।”

“কী সূত্রে পরিচয়?”

বন্ধুটি হো হো করে হেসে উঠল। বললে, “জেরা করে করে আপনার কৌতূহল মেটাতে চান। কিন্তু আমি বলি, কৌতূহল মেটাবেন না। আপনি তো আসামেব সব শহরেই ঢু মারেন। বনেলীর পরিচয় একটু চেষ্টা করলেই জানতে পারবেন। আর আমিই বা ওর কতটুকু জানি। ও চলমতী নদীর মত। ওব তীরে তীরে ঘুরলে তবে তো উৎসের সন্ধান পাবেন।”

বনেলী সম্পর্কে আলোচনা সেখানেই শেষ হল। সেদিনকার সান্ধ্যভ্রমণে বনেলী-প্রসংগ আর পাত্তা পেল না। আমিও ডিব্রুগড়ে পাঁচ ছ'দিন থেকে ধুবড়ী চলে এলাম।

বৈশাখ তখন শুরু হবে। ধুবড়ীতে আমার মাত্র তিন দিন থাকার কথা। কিন্তু এ তিনদিনে আমি যেন ধূলিময় হয়ে গেলাম।

ব্রহ্মপুত্রের ধূ ধূ করা বালিচড়া থেকে চূর্ণ চূর্ণ বালি উড়ছে দিনরাত্রির হাওয়ায়। সারাটা শহর একস্তর বালিতে বিভূতি-ভূষণ মহাদেবের মত ধূলিপিংগল। গাছের সবুজ পাতা দেখা যায় না। সারাদিন শুধু ধূলির অদৃশ্য ঝড়! তৃণগুল্ম, তরুলতা সব ধূলিতে ধূলিতে একাকার। সব শাদা।

ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে ডাকঘরের সামনে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এসেছে। হাওয়া বইছে প্রচণ্ডভাবে। আকাশের ঈশান কোণে কিছুটা কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে। হঠাৎ অবাক হয়ে গেলাম বনেলীকে দেখে। যাকে মাত্র সাত আটদিন আগে ডিব্রুগড়ে দেখে এসেছি, তাকে ধুবড়ীতে দেখব, প্রত্যাশা করিনি।

পথের অপর দিক থেকে একাই হেঁটে আসছিল বনেলী। সেদিনের ঠিক সেই বেশ। সামনা সামনি এসে পড়তেই চিনলাম।

এগিয়ে এসে জিগগেস করলাম—"আপনাকে না ডিব্রুগড়ে দেখে এসেছি?"

সে আমাকে ঠিক চিনললনা। সম্ভবত আমি তখনো ওর কাছে ভিড়ে-দেখা মুখ। যে মুখ ওর স্মরণের তলানি ছাড়া আব কিছু নয়।

"ঠিক চিনতে পারছিনে আপনাকে।" সে বললে।

"বা রে, ডিব্রুগড়ে সেই চার্চের কাছে আপনি বসে ছিলেন। আমার বন্ধু আপনার কাছে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। মনে নেই?"

"হাঁ, মনে পড়েছে। যিনি আপনাকে নিয়ে গিযেছিলেন, তিনি কি আপনার বন্ধু?"

"বন্ধুই বটে। তবে ঘনিষ্ঠভাবে তাকে জানিনে।"

"তবে বন্ধু নয়, পরিচিত বলুন।"

"হাঁ, তাই। কিন্তু আপনি কী বলতে চান, বলুন তো?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল বনেলী। তারপর কী যেন বলার

জন্য ইতস্তত করতে লাগল। শেষে বলল—"আমি আপনাকে চিনি নে। আপনি অজ্ঞাত কুলশীল। আমি নীরব থাকতেই চাই।"

গম্ভীর হয়ে বললাম—"বেশ। কিন্তু একটা কথা। দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়ানোটা আমার পেশা। আমি কারো ক্ষতি করব না, একথা বিশ্বাস করতে পারেন।"

সে বললে—"আপনি যে প্রায় রাগ করছেন। রাগ বা দুঃখ যদি না হয়, তবেই বলি।"

"না কোনটাই হবে না, আপনি বলুন।"

বনেলী বললে—"এককালে উনি নিষ্ঠার সংগে রাজনীতি করতেন। কিন্তু এখন আপনার পরিচিত ভদ্রলোকটি গোয়েন্দাগিরি করেন।"

সহসা খানিকটা অবাক হলাম বৈকি। শেষে বললাম—"সেজন্য বুঝি কথার মারপ্যাঁচে ওকে আপনি আপনার কাছ থেকে হঠিয়ে দিলেন।"

"হাঁ, ঠিক ধরেছেন," বললে মেয়েটি।

আবার আমরা চুপচাপ হয়ে গেলাম। দুজনে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছি। কেউ আগে পিছে হাঁটছিনা। বনেলী কেবল মাঝে মাঝে হাতের ছাতার বাঁট দিয়ে রাস্তায় খড় খড় আওয়াজ তুলছিল।

শুধালেম—"হঠাৎ ধুবড়ীতে এসেছেন কেন?"

ও বললে—"টেলিগ্রাম পেয়ে। বাবার ভারী অসুখ করেছিল। তিনি এখানকার একজন সরকারী অফিসার। এসে দেখলাম, তিনি ভালো হয়ে গেছেন। আমি কালই চলে যাব গৌহাটিতে।"

জিগগেস করলাম—"আপনি বাবার সংগে থাকেন না কেন?"

সে হেসে বললে—"কাজের ক্ষতি হবে তাহলে।"

কাজ যে কী, সে কথা জিগগেস করার সাহস হলনা। কেননা

শালীনতা বোধে সেটা বাধে। বলাও যায় না, হয়ত' কোন চাকরিও করতে পারে মেয়েটি।

বললাম, "আমিও কিন্তু কাল সন্ধ্যের ট্রেণে গৌহাটি যাব।"

"বাঃ তাহলে একই সংগে যাওয়া যাবে। আমি কিন্তু থার্ড ক্লাসের যাত্রিনী," মেয়েটি হেসে বললে।

পরদিন সন্ধ্যের সময় প্ল্যাটফর্মে গাড়ীছাড়া পর্যন্ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু মেয়েটি এলনা। নিজের মনকে বললাম এত প্রতীক্ষা কিসের? ভারী তো মেয়েটি। সে কেমনতর মেয়ে, যার কথার কোন দাম নেই। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবলাম, হয়ত পুনর্বার বাবার শরীর খারাপ হয়েছিল। নয়ত' মেয়েটিরই শরীর ভালো নেই। কিংবা কোন গুরুতর প্রয়োজনে আটকা পড়েছে।

আমিনগাঁও-পাণ্ডু হয়ে গৌহাটিতে চলে এলাম। গৌহাটিতে আমার দিনদশেক থাকার কথা। ভাবলাম, এর মধ্যে বনেলী নিশ্চয় গৌহাটি এসে পড়বে। আবার কোন একটা রাস্তার মোড়ে দেখা হয়ে যাবে। আর আমিও যেমন। যাযাবর তো পথে দাঁড়িয়েই পরিচিতের কুশল জিজ্ঞাসা করে। এই তো রেওয়াজ।

কিন্তু সত্যিই একটা কৌতূহল যেন পরিমাণে কিংবা ডিগ্রীতে বেড়ে বেড়ে যাচ্ছিল। পরিচয় হলেই ফ্যাসাদ। আরো পরিচয় জানতে ইচ্ছে করে। আর ডিব্রুগড়ে পরিচয় না হলে ধুবড়ীতে ওকে দেখে চিনতাম না। এমনি কত অজানিত নরনারীই চোখের সামনে বারবার ঘোরাফেরা করে। হয়ত বারংবার কাউকে নানান জায়গায় দেখলেও কোন কৌতূহল বোধ করিনা। কেবল যার দিকে মনের প্রদীপ তুলে ধরি, তাকে নানা জায়গায় দেখলেই কৌতূহল।

যাঁরা আমার মত কেবলই শহর থেকে শহরে, গঞ্জ থেকে গঞ্জে ঘুরে বেড়ান, তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন আমার পক্ষে। যাযাবরের কাছে দুনিয়াটা

বড়, কাজেই পরিচয়ের গণ্ডী বৃহৎ। সুতরাং, ঘুরতে ঘুরতে এত দেখা যায়, এত জানা যায়, এত শোনা যায় যে, বলার কথা নয়। ক'লকাতায় কোন সীমাবদ্ধ চৌহদ্দিতে বাস করে', এবং ট্রামের মান্থলি নিয়ে একটি বিশেষ রাস্তায় যাতায়াত করে' সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে পরিচয়ের গণ্ডী বাড়ানো তেমন সম্ভব নয়। কিন্তু পথে নেমে আসুন। দেখবেন আপনি অভিজ্ঞতায় ক্রমেই বিশাল হয়ে উঠছেন। যেমন নদী বড় হয়ে উঠে চলতে চলতে।

বনেলী সম্পর্কে আমার কৌতূহল বেড়ে যাওয়ার কারণ? এমন কোন অঘটন ঘটেনি, যার জন্য ওর কথা মনের মধ্যে বারবার উঁকি দিতে পারে। আমি যদি নিজেকে স্রোতের শ্যাওলা মনে করি, তবে ও স্রেফ স্রোতের ফুল। ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে ঘাটে সে হারিয়ে যাবে আমার কাছে। আর আমি তখন হয়ত' কৃষ্ণার কূলে বেজোয়াডায়, কিংবা গোদাবরীর কূলে রাজামহেন্দ্রীতে কোন হোটেলে অবস্থান করব। জীবনে কত মানুষের সংগেই পরিচিত হলাম। বনেলী তারই একজন।

অথচ কী আশ্চর্য, কৌতূহল এমনি একটা জিনিস যা বেড়েই চলে। শেষ পর্যন্ত গৌহাটিতে আমার জানাশোনা কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকেই বনেলী সম্পর্কে জিগ্‌গেস করলাম। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না। বনেলীর নাম শুনেছে, এমন একটি লোকও পেলাম না।

তবে? সবই কি ভূয়া? বনেলী আসলে রাজনীতি করেনা, কিংবা আমার পরিচিত রাজনৈতিক কর্মীরা আনাচ কানাচের খবর রাখেন না। অথবা বনেলী ছাড়াও তার অন্য নাম আছে।

ভয়ানক সংশয়ের দোলায় দুলতে লাগলাম। মেয়েটির অমন সুন্দর মুখ। একরাশ কোঁকড়ানো চুলের বাগানে মুখখানি যেন হাসি

হাসি ফুল। একটা মিষ্টি কোমলতা ছড়িয়ে আছে মুখের চামড়ায়। সচরাচর পাহাড়ী মেয়েদের মধ্যে এমন সৌন্দর্য চেখে পড়ে না। আর ওর হাঁটার কী দৃপ্ত ভংগিমা। বাঙালী মেয়ের আড়ষ্টতা নেই, সিন্ধী মেয়ের রুক্ষতা নেই, মারাঠি মেয়ের কৃশতা নেই।

অমন মেয়েকে ভূয়া বলে ভাবাটাও অন্যায়। আর তা ছাড়া, ও তো নিজে ওর কোন পরিচয় দেয়নি। আমিই তো সৃষ্টি করেছি ওকে নিয়ে ভাবের একটি পরিমণ্ডল। বন্ধু শুধু বলেছিল, বামপন্থী রাজনীতি করে। ঐ কথার উপর আমিই রচনা করেছি কল্পনার সৌধ।

কত হবে বনেলীর বয়েস? তিরিশের নিচে। কিন্তু পাহাড়ীদের বয়েস বোঝাও কঠিন। ওদের মেরুদণ্ড সহজে বাঁকে না; ওদের গায়ের চামড়া একটু দেরীতে কুঁচকায়।

শেষ পর্যন্ত একজন রাজনৈতিক কর্মী বন্ধু-হিসেবে বললেন—"চলুন, কয়েক ঘর মিকির আছে শহরতলীতে। দেখে আসি, তাদের ভেতর আপনার বনেলীর খোঁজ পাওযা যায় কি-না।"

প্রস্তাবে রাজী হলাম খুশি মনে। বন্ধুটিব সংগে যখন পাহাড়ীদের ঘরে উপস্থিত হলাম, তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

কী আশ্চর্য, সেই সন্ধ্যেয় দেখি ছোট্ট সভা বসেছে পাহাড়ীদের। এক ফালি উঠোনে মেয়েরা আর পুরুষেরা জমায়েত হয়ে যার বক্তৃতা শুনছে, সে আর কেউ নয়, বনেলী।

বনেলী লক্ষ্য করেনি। চুপচাপ ছোট্ট ভিড়ের একদিকে দুজনে বসে পড়লাম। বনেলী বলছিল উজবেক, কাজাক, কিরঘিজ নরনারীর গল্প। অবাক হয়ে গেলাম। 'সমরকন্দে উষা' বইখানি সে নিশ্চয় পড়েছে। না হলে ঠিক ঐ ধরনের গল্প কেমন করে বলতে পারবে। চীন আর সোবিয়েতের গল্প বলছে পাহাড়ীদের কাছে। সমাজতন্ত্রের দেশে সুখী শিশু ও নরনারীর অবস্থা বর্ণনা করে চলছিল।

আমার সংগী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন—"আশ্চর্য, এ ভদ্রমহিলাকে তো আমরা চিনিনে। কী সুন্দর ঘরোয়া বৈঠক জমিয়ে তুলেছেন। অথচ, ওঁকে আমরা কেউ চিনিনে।"

চুপে চুপে বললাম—"সম্ভবত, ঢাকঢোল পেটাতে উনি ভালোবাসেন না।"

সংগী বললেন—"কিন্তু তাহলেও এমন একজন মহিলার কথা আমাদের কান এড়িয়ে যাবার কথা নয়।"

বললাম—"আমি তো শুনেছি, সমতলের লোকের ভেতরেই আপনাদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ। পাহাড়ীদের ভেতরে আপনারা ঢুকতে পারেননি।"

সংগী চুপ করে গেলেন। ততক্ষণে সভাতে একটু সোরগোল উঠেছে। দুজন সমতলের অধিবাসীর উপস্থিতি একটু বেমানান ঠেকছিল। পাশের এক পাহাড়ী অপর পাহাড়ীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে "স্পাই ?"

আর একটু যেন গুঞ্জরণ উঠল। ইতিমধ্যে বনেলীর দৃষ্টি আমাদের দিকে আকর্ষিত হয়েছে।

সে আমাকে ঠিক চিনতে পারল এবার। নিজের সম্মানিত-জায়গা ছেড়ে আমাদের দিকে উঠে এল।

আমার দিকে হাঁত বাড়িয়ে বললে—"হ্যাল্লো, আপনি যে। আমি সেদিন একই গাড়ীতে আসব বলে কথা রাখতে পারিনি। তজ্জন্য বড় দুঃখিত।"

"না না, দুঃখিত হবার তেমন কিছু কারণ নেই" সংকোচ দেখিয়ে বললাম।

"কোথায় উঠেছেন ?"

—"ডাকবাংলোয়।"

"বেশ, আপনাকে আমি কাল খুঁজে নেব। তখন কথা হবে। এখন আপাতত সভাটা চালিয়ে যাবার অনুমতি দিন।" সে হাসি মুখে বললে।

এরপর ওখানে আর থাকা চলে না। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম। দুজনের সংগেই করমর্দন করল বনেলী। সেই হাস্যময়ী পাহাড়ী নারী।

ফিরে আসতে পথের এক বাঁক ঘুরে সংগী বললেন—"বড়ই অবাক লাগছে।"

জিগগেস করলাম—"কেন?"

সংগী বললেন—"আপনি ক'লকাতা থেকে উড়ে এসে যাঁকে চিনতে পারলেন, তাঁকে আমরা গৌহাটিতে বসেও চিনতে পারলাম না।"

"কিন্তু আমিই বা চিনলাম কই?"

সংগীটি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বললেন—"আসাম বিধান-সভায় যে সমস্ত পাহাড়ী জাতির প্রতিনিধি আছেন, তাঁরা অসমীয়া বা বাঙালীদের রাজনৈতিক কোন্দলে ঠিক যেন নেই। একটা আলাদা আলাদা ভাব। পাহাড়ী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাতন্ত্র্য ওরা মনে মনে ঠিক পোষণ করেন।"

বললাম, "বনেলীও সেজন্য বোধ করি একটু আলাদা আলাদা, অথচ রাজনৈতিক আদর্শে আপনাদের সংগে ও প্রায় এক।"

সংগীটি চুপ করে গেলেন। পানবাজারের কাছাকাছি এসে আমরা ছাড়াছাড়ি হলাম। সংগীটি কী একটা কাজে অন্য দিকে চলে গেলেন।

খুব ভোরেই পরদিন ডাকবাংলোয় এলো বনেলী।

এসেই বললে—"খুব জরুরী কাজ না থাকলে চলুন আমার সংগে।"

"কোথায় ?"

"কোথাও নয়, ব্রহ্মপুত্রের তীরে নিরালা জায়গায়।"

"বেশ, চলুন।"

তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় পরে ওর সংগে রওনা দিলাম। ব্রহ্মপুত্রের তীরে সত্যিই এক নিরালা জায়গায় সে আমাকে নিয়ে এল।

তখনো রোদ কড়া হয়নি। জলের ধারে একটা বড় পাথরের উপর আমাকে বসতে বলে' সে নিজে কাছেই একটি পাথরের উপর বসল।

শুধালে—"আপনাকে যে এখানে নিয়ে এলাম, তাতে আশ্চর্য লাগছে আপনার ?"

বললাম—"না, না, আশ্চর্যের কি আছে।"

ও বললে—"আপনার সম্পর্কে আমার ভারী কৌতূহল জেগেছে কাল সন্ধ্যে থেকে। বলুন তো আপনি কে ?"

"কেন, কিছু সন্দেহ হয় ?" শুধালেম।

"না, না, সন্দেহ নয়। তবু সমতলের লোক আপনি। আপনার সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করি।"

"কি জানতে চান ?" শুধালেম।

"আপনি আমাকে কি চোখে দেখেন ?"

"শ্রদ্ধার চোখে।"

"শ্রদ্ধা কেন ?"

"আভাসে বুঝেছি যে, আপনি সারা আসাম ঘুরে বেড়ান। এবং মিরি, মিকির বা অন্যান্য পাহাড়ীদের মাঝখানে গিয়ে একটি নতুন আদর্শের কথা গল্পের ছলে প্রচার করেন।"

"তার বেশি কিছু জানেন নি ?"

"না, সে সৌভাগ্য হয়নি।"

এরপর কোন প্রশ্ন না করে' চুপ করে' গেল বনেলী। তার সেই হাসি হাসি মুখে গম্ভীরতার ছাপ পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরে বললে—"শুধু প্রচারে হয়না, আরো কিছু গভীর জলে নামতে হয়।"

কথা কয়টি বলে সে হাসল। বললে - "কিন্তু আপনার সম্পর্কে কিছু বলছেন না যে ?"

একটু যেন ঘেমে উঠলাম। নিজের সম্পর্কে কী বলব ? কী বলা সমীচিন ? কী বললে সে সন্তুষ্ট হবে ? অবশেষে সাতপাঁচ ভেবে বললাম - "পবিচয় দেবাব মত আমার কিছু নেই। আমি নগণ্য।"

"বুঝেছি আপনি বড় বিনয়ী", সে মাথা নেড়ে হাসলে।

"কদিন থাকবেন গৌহাটিতে ?" প্রশ্ন করলাম।

"বলা কঠিন," সে জবাব দিল।

'আপনার মত আব কজন পাহাডী মহিলা রাজনীতিব এই সরল ব্রত নিয়েছেন ?" শুধালেম।

ও বললে "ব্রত আবাব কি ? পাহাডী জাতির প্রতি জন্মগত কর্তব্য পালন করছি। সমতলেব লোকের পক্ষে পাহাডীদের মধ্যে ঢোকা কঠিন ব্যাপাব। তা ছাডা, আমার কাজ একান্তভাবে ঘরোয়া। আমি শুধু সাধ্যমত মাটিতে লাংগল দিচ্ছি।"

আবার দুজনে চুপচাপ হয়ে গেলাম। ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে এক ঝাঁক বুনো হাঁস উড়ে যাচ্ছিল হিমালয়ের দিকে। বৈশাখের ক্ষীণ-স্রোতা নদীতে জেলে নৌকা ভাসছিল। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে একটা শান্ত ভাব।

সে বললে—"আপনার ক'লকাতার ঠিকানা দিয়ে যাবেন। আমার কলকাতা যাবার ইচ্ছে আছে। গেলে খবর দেব।"

বনেলীর সংগে আর দেখা হয়নি।

অথচ, বহুদিন ওর কথা আমার মনে হয়েছে। ওর নামের সংগে জড়িয়ে আছে স্মৃতির সুরভি। সেই একরাশ কালো চুলের ভেতর ফুলের মত মুখ। আর হয়ত ওর সংগে দেখা হবে না। কিংবা দেখা হলে কি অবস্থায় দেখা হবে, জানিনে। অথবা, সে যখন ক'লকাতা আসবে, তখন আমি বম্বে কিংবা দিল্লীতে অধিষ্ঠান করব।

এক অদম্য কৌতূহলের ভেতর দিয়ে তুজন আমরা কত কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু যাযাবর জীবনের ঘূর্ণীতে আবার ছিটকে পড়েছি। আর ছিটকে পড়াই তো মংগল।

বনেলীর সাধনা নিরলস। নীরবে ও সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছে। হয়ত' একদিন বৃহৎ কোন আন্দোলনে সে যুক্ত হবে। তার তারকার জ্যোতি এখনো লোকচক্ষুর বাইরে। কিন্তু একদিন সে তারা চমক দিতে পারে।

আর আমি চলেছি। কী ফুল, কী ধূলো পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি, জানিনে। নিরাসক্ত নির্বিকার হয়ে চলেছি। আমার পথের তু'ধারে অগণিত জনপদের নরনারী। আমি তাদের আশা-আশংকা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই। কোথাও জড়িয়ে পড়ার ফুরসুৎ নেই।

তবু চলতে চলতে আবার ওদের কথাই মনে করি। ওরা সৃষ্টি করছে জীবনবেদ, আর আমি কেবল তাদের ভাষ্যকার। ওরা এক নয়, তুই নয়, পুরো মিছিল। আমি চোখ মেলে ওদের দেখি, কাণ পেতে ওদের আওয়াজ শুনি। ওরা আমার মহাভারতের শত নায়ক নায়িকা।

একদিন চলতে চলতে আমিও হারিয়ে যাব। হারিয়ে যাবে আমার জীবনের চৌষট্টি রস। প্রবহমান জীবন-ব্রহ্মপুত্রের ধারায় তলিয়ে যাবে আমার দেহ-দেহলী-গুঞ্জরিত ভালবাসা।

কিন্তু লক্ষ-আমির মধ্য দিয়ে জনগণ এসে আবার জনপদকে সুস্থ-ভালবাসায় পূর্ণ করে দেবে। এবং সেদিনের কি খুব দেরী আছে?

রাক্ষুসে নদী

॥ এগার ॥

"চাঁদকে এমন লাল্‌চে দেখাচ্ছে কেন দিদি ?"

দশ বছরের একটি ছেলে প্রশ্ন করল তের বছরের একটি মেয়েকে। দিদি বলল, "তুই চোখে লাল ওষুধের ফোঁটা দিয়ে এসেছিস বলে।"

কিন্তু সন্দেহে দিদিই আবার তাকাল চাঁদের দিকে। না, সত্যিই তো, বাঁকা চাঁদের চোখ যেন কিছুটা লাল।

এমন সময় পুলিশ এল ছুটে। কড়া আওয়াজে বললে—"বাড়ি যাও, বাড়ি যাও, নদীর পাড়ে থাকবে না।"

ভাই বোন ভয়ে হাত ধরাধরি করে চলে গেল শহরের দিকে। কিন্তু তখনো নদীর দেড় মাইল আন্দাজ দীর্ঘ পাড়ে অনেক লোক জমে আছে। লোক আসছে, লোক যাচ্ছে। নদীকে দেখতে আসছে সবাই। শহরের পঞ্চাশ হাজার লোক সকাল-সন্ধ্যায় পালা করে দেখছে নদীকে।

ভাদ্র মাস। অমাবস্যা গিয়ে শুরু হয়েছে শুক্লপক্ষের। চাঁদের রূপালী পাপড়ির কিছুটা খুলেছে। কিন্তু বৃষ্টি। বর্ষণের কি শেষ আছে ? দিনের বেলা জলদ মেঘে আকাশ পূর্ণ থাকে। কেবল মাঝে মাঝে বৃষ্টি বন্ধ হয়।

আর নদী ? এখন তো অন্ধকার হয়ে গেছে। এখন তো ক্ষীণ চাঁদের ঈষৎ আলোয় চরাচর কেবল জলায়ত। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত দেখা গেছে নদীর বুককে। পরিপুষ্ট বুক, পেশীবহুল,

রাক্ষুসে নদী। কী তার দৌড়ের দ্রুত ভংগিমা। ঘণ্টায় কুড়ি মাইলের উপর স্রোতের বেগ। মানুষ দৌড়ে পারবেনা তার সংগে। খলখল, চাতুরীপূর্ণ তার হাসি।

সে গ্রাস করছে এই ছোট্ট শহরকে। গ্রাস করছে মানুষের তৈরী ঘর বাড়িকে। ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে নরনারী। সারাদিন উঠতে বসতে সকলের এক চিন্তা। সব ঘর বাড়ি কি তলিয়ে যাবে? নদী যদি হঠাৎ শহরের বুক চিরে বইতে আরম্ভ করে। তাহলে কেউ বাঁচবে না।

তাই, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সবাই নদীর খবর নেয়। খবর নিতে নদীর পাড়ে লোক পাঠায়। যার টেলিফোন আছে, সে টেলিফোনে খবর নেয়। খবরের কাগজের লোকেরা ক'লকাতায় খবর পাঠায়। দিল্লীতে লোকসভায়, রাজ্যসভায় আলোচনা শুরু হয়। অত বড় একটা শহর কি শেষ পর্যন্ত স্রোতের মুখে খড়কুটো হয়ে ভেসে যাবে? অমন একটা ছবির মত সাজানো শহর।

ছবির মত সুন্দর একটি পুরনো গীর্জা। রোববারের প্রার্থনা দিনে দিনে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সন্ধ্যের পর পাদ্রী এসেছেন নদীর পাড়ে। বুকের উপর ক্রুশ এঁকে তিনি বারংবার প্রার্থনা করছেন, যেন গীর্জাটি এবার বেঁচে যায়। মনে মনে তাঁর আশংকা আছে। নদীর আজ বড় বাড়াবাড়ি। যদি গ্রাস করে গীর্জাকে। যদি আজ রাতেই তলিয়ে যায় প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চের উঁচু চূড়া।

পাদ্রী অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর চুলগুলি শনের মত খাড়া হয়ে গেল। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা-কেন্দ্রকে গ্রাস করবে শেষে নদী? ধর্মের প্রতীককে শেষে ভাসিয়ে নেবে জলস্রোত? পাদ্রী এক পা, দু' পা করে নদীর দিকে এগিয়ে এলেন। তাকালেন রাশি রাশি জলের দিকে। চাঁদের ঈষৎ আলোয় বেশি কিছু ঠাহর

হয়না। অথচ অনুভব হয় নদীর শক্তিকে। পাদ্রী আবার পেছিয়ে গেলেন।

তিনি ঘেমে উঠেছেন। রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন ঘষে ঘষে। ভাবলেন, শ্রীনেহরু আজকালের মধ্যে দিল্লী থেকে এসেছেন কিংবা আসছেন। সরকার যদি নদীর কোন ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আবার মনে মনেই তিনি হাসলেন। সরকারের তৈরী দেড় হাজার ফিটের বাঁধ তো ভেঙে গেল বলে। অপদার্থ সরকার। নিজেদের পুরনো সার্কিট হাউস, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিসই বাঁচাতে পারছে না।

প্রিয়-গীর্জার দিকে তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর তাকালেন হিমালয়ের দিকে। আধো-অন্ধকারে হিমালয় মিলিয়ে আছে। দেখা যায় না হিমালয়কে। গা ঢাকা দিয়ে আছে বিরাট পর্বত। অথচ, ঐ পর্বতই সমস্ত দুঃখের কারণ। ওর গা বেয়ে যে-নদীগুলি নামছে, ওরাই সৃষ্টি করেছে এই তাণ্ডব। আসাম থেকে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার মাইল এলাকায় বন্যা। হিমালয়ের নিচে নিচে শত শত নদী উপনদী জলভারে কিলবিল করছে।

পাদ্রী আবার ক্রুশ আঁকলেন বুকে।

আরো গেল দু' দিন। অস্থির হয়ে উঠল শহরের নরনারী। সরকারী দেড় হাজার ফিটের পাথরের বাঁধ নদী গ্রাস করেছে। কাল দুপুরের দিকে পুরনো সার্কিট-হাউস নদীর বুকে আফিম খোরের মত ঢলে পড়েছে। নদীর জল কিছু কমলেও নদীর ক্ষুধা এতটুকু কমেনি। পুরনো ডিষ্ট্রীক্ট ক্লাব, ডাকঘর-টেলিগ্রাফ অফিসকেও খেয়ে সাফ করে দিয়েছে। মাত্র দু' দিনে এত কাণ্ড।

গতকাল সকালে শ্রীনেহরু সাহস দেখিয়ে ডাকঘরের পাশে নদীর ভাঙনের একেবারে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আবার কাল

বিমানে ভুটান পাহাড় এবং পাহাড়ী এলাকা থেকে দক্ষিণে নদী বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে চারশো মাইল ঘুরে এসেছেন।

কিন্তু তাতে হয়েছে কি? কাল সমস্ত রাত ধরে' নদী অট্টহাস্য করেছে। আর পাগলের মত মানুষের সৃষ্টিকে ভেঙেছে। তার গতিবেগে থরথর করে কেঁপেছে পাড়ের মাটি। বলির পাঁঠার মত কেঁপেছে মাটির কোষে কোষে তৃণমূল।

আজ সকালে নদীর দিকে চাইতে ভয় হয়। কখন সে তার শয্যা ছেড়ে উঠে আসে! কখন সে চিরে ফেলে শহরের ভীরু বুক। তাই শহর এ দু' দিন ধরে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। তিনকোনিয়া এলাকার এক হাজার বাড়ির নরনারী প্রায় কান্না জুড়ে দিয়েছে। চারদিকে আতংক।

স্কুলে গিয়ে কোন ভূগোলের মাস্টার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর ঘূর্ণ্যমান অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিমে প্রবহমান ধারার গতিপথ বর্ণনা করতে শুধু আরম্ভ করেছিলেন। এমন সময় খবর এল তাঁর বাড়ির সামনে মিউনিসিপ্যালিটির পাকা পথ নদী গর্ভে এই মাত্র ধ্বসে পড়েছে। তিনি বাড়ির দিকে ছুটলেন।

শহরের বারলাইব্রেরীতে জনকয়েক উকিল একটি মুসাবিদার উপর ঝুঁকে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাঁরা ঐ মুসাবিদায় প্রার্থনা জানাতে চান, যেন অবিলম্বে শহরকে রক্ষার জন্য চীন থেকে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করা হয়।

একজন বৃদ্ধ উকিল বললেন—"আপনারা যতই দরখাস্ত বা টেলিগ্রাফ পাঠান, সরকার কিছু করবেন না।"

জবাবে একজন তরুণ উকিল বললেন—"কেন, চীনের সংগে তো ভারতের এখন দহরম মহরম। যে-বিশেষজ্ঞেরা হোয়াংহোর অববাহিকাকে বন্যা থেকে বাঁচিয়েছে, তাঁদের এ-দেশে নিয়ে আসা হোক।"

বৃদ্ধ উকিল শুধু হাসলেন। তাঁর চুল পেকে গেছে। কিছুই জানতে বাকী নেই। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দকেও তিনি যেন চেনেন।

হেসে তিনি বললেন—"লাল-ফিতেয় এ সরকার বাঁধা। বড় জোর পাঁচসালা পরিকল্পনার একটি বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গৃহীত হবে। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। আর এ বছর তো তাড়াতাড়ি কিছুই হবে না। শীগগিরই হয়ত নন্দ বলবেন যে, সরকার বন্যারোধে অক্ষম। বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাত যেমন বন্ধ করা যায় না, তেমনি বন্যাও রোধ করা যায় না।"

আর একজন উকিল বললেন—"কেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন সরকার। আণবিক শক্তি কমিশন বসিয়ে মেঘকে অন্যদিকে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হোক।"

বৃদ্ধ উকিলটি এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। বললেন—"আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। না-হলে অমন কথা বলতেন না। শ্রীনেহরু এসে দেখে শুনে গেলেন। এখন দরখাস্ত বা টেলিগ্রাম না-পাঠিয়ে অপেক্ষা করুন। দেখুন আজই হয়ত' তিনি কোনো বিবৃতি দেবেন।"

বৃদ্ধ উকিলের কথাই সত্য হল। পরদিন দৈনিক সংবাদপত্রে শ্রীনেহরুর বিবৃতি প্রকাশিত হল। নেহরু বলেছেন, "শহরের অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে বলে এত যে হৈ চৈ, তা একেবারে বাড়াবাড়ি। কাল সকালেই আমি শহরটি দেখে এসেছি। বন্যা এবং ভাঙনে শহরের বেশির ভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে নদীশাসন সম্পর্কে কি করা যায়, তা ভেবে দেখা হচ্ছে।"

নদীর অট্টহাস্য কিন্তু থামল না। পারাপার ভালো করে দেখায় না, এত জলরাশি। প্রায় পাঁচ মাইল আন্দাজ চওড়া বুক। তাতে

ঘূর্ণি, তাতে আওয়াজ। আর স্রোতের কী বেগ। ঐরাবত ভেসে যাবে এক নিমেষে। এ-নদী আসছে তিব্বতের ভেতর দিয়ে লাসাকে ছুঁয়ে। মহা-উচ্চতা থেকে সমতলে নামতে নামতে তার গতিবেগ ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছে।

অথচ, উনিশ শ' এগার সালে শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে নাকি ছিল নদী। উনিশ শ' সতের সালে তার ধারা দিক পরিবর্তন করল। সেই থেকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ভেঙে ভেঙে সে পাঁচ বছরের মধ্যে শহরের একেবারে প্রান্তে এসে গিয়েছে। এখন উনিশশ' চুয়ান্ন।

মেমের গোলাপী মেয়েটি তার মায়ের সংগে গীর্জা দেখতে এসেছে। থলথলে, কোমল চেহারা। মাখনের মত নরম হাত পা। বছর বারো বয়েস।

মেম কিন্তু দিশী নয়, খাঁটি বিলিতি মেম। মাইল দশেক দূরে এক চা-বাগানের ম্যানেজারের স্ত্রী। চা-বাগানের কুলি-বস্তিকে বাঁচিয়ে ঘন চায়ের বনের ভেতর ভারী সুন্দর বাংলোয় ওরা বাস করে। বাংলোর ভেতরে ঐশ্বর্য অঢেল। দুধের মত শাদা শয্যা, এক ডজন দাস-দাসী, ফুলের বাগান, দুটি বড় বড় কুকুর, একখানি সুন্দর মোটর গাড়ী, রেফ্রিজাবেটারে পুষ্টিকর খাবার, ঘরের মেঝেয় দামী কার্পেট, হরিণের শিঙে শিঙে সুন্দর সুন্দর টুপি। বাংলোকে ঘেরাও করে আছে তারের সরু জাল। মশাকে বাংলোয় ঢুকতে দেয়া হবে না বলে এই বন্দোবস্ত। আর তারের সরু জালে লতিয়ে আছে নানান ফুলের লতা। বর্ষার ফুল আর বসন্তের ফুল—দুই-ই তাতে পালা করে ফোটে।

সেই ঐশ্বর্যময় বাংলোর ম্যানেজারের স্ত্রী এসেছেন মেয়ের হাত ধরে শহরে। শহরের ক্লাব থেকে হুইস্কি, বীয়ার, সিগারেট, স্নো, বিস্কুট ইত্যাদি কেনাকাটা করে তিনি নদীর পাড়ে এসেছেন। সন্ধ্যের পর

"সে চিন্তে তোমায় নয় মা, ঈশ্বরের।" পাদ্রী হেসে বললেন।

মা ও মেয়ে চলে গেল।

কিন্তু পাদ্রীর মাথার ভেতর মেয়েটির প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগল। গীর্জার কি হবে? এই ঘাসে-ভরা গীর্জার অংগনের কি হবে? শতাব্দী পেরিয়ে এসে শেষে ঢলে পড়বে বন্য নদীর বন্যায়? ধর্মীয় সভ্যতার এত বড় বাহক শেষে জলে তলিয়ে যাবে? এই থিলানে যত প্রাচীন স্থপতি আছে, তাকে গ্রাস করবে নদী? এ অংগনে আর ফুল ফুটবে না। রোববারে আলো জ্বেলে বাইবেল পাঠ আর হবে না।

ঘাসের উপর পাদ্রী বসে রইলেন। ক্রমে রাত হল। ক্রমে চরাচরে মেঘলা জোছনা পড়ল ছড়িয়ে। আজ আকাশ একটু পরিষ্কার। কিন্তু বলা যায় না, কখন যে ঈগল পাখীর মত জলদ মেঘ উড়ে এসে চাঁদকে গ্রাস করবে। আর মেঘ তো আসবেই। তবু পাদ্রীর মনে হল, বর্ষার মাঝখানে আজই যেন শরতের একফালি রাত উড়ে এল।

নদীর ঘোলা জলে থল থল করছে মেঘলা জোছনা। এ-তল্লাটে লোক চলাচল নেই। কখন যে নদী পাড়ে ফাটল ধরায়। ভয়ে লোক চলাচল বন্ধ। বিশেষত, সন্ধ্যার পরে।

গীর্জার মায়ায় পাদ্রীই কেবল এ তল্লাটে অনেকক্ষণ থেকে যান। কিসের যে মায়া, তাও তিনি বোঝেন না। তবু একটা আকর্ষণ।

নদীর জল একটু একটু কমছে। তাতে আশা আছে যেমন, ভয় আছে তেমন। জল যখন কমবে, তখন টানও পড়বে মাটিতে। জলের সে প্রচণ্ড টান সাংঘাতিক। সামনে আবার পূর্ণিমা।

কিন্তু বসতে বসতে পাদ্রীর মনে ভয়-ভয় অবস্থা এল। সহসা যেন মনে হল, সামান্য মাটি কেঁপে উঠেছে। মাটি যেন একটু

নামল। তবে কি ভূমিকম্প? এ শহরে তো হামেশাই আছে মাটির দোলন।

না। তিনি আশ্বস্ত হলেন। ভূমিকম্প নয়। সম্ভবত কিছুই নয়। উৎকণ্ঠায় ওরকম ভয় জাগতে পারে। তিনি বুকের উপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন। তারপর গীর্জার অংগন ছেড়ে বাড়ির দিকে চললেন। ইতিমধ্যে চাঁদ আবার মেঘে ঢাকা পড়েছে। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে।

চিন্তার উর্ণনাভ হয়ে তিনি চলেছেন। পথে একটি রিকশাও মিলছে না। লোকজন দ্রুত ছোটাছুটি করছে। বৃষ্টিতে তার ফর্সা পোশাক ভিজতে লাগল। ছাতা আছে, কিন্তু মেলে ধরবার কথা মনে নেই।

সহসা একটি বিরাট আওয়াজ। এ আওয়াজের সংগে তিনি পরিচিত। এ রকম আওয়াজ করেই পুরনো সার্কিট হাউস নদীর বুকে ঢলে পড়েছে। শহর চমকে গিয়েছিল সে আওয়াজে। এখন ঠিক ঐ ধরনের আওয়াজ হল। পাদ্রী অস্থির হয়ে উঠলেন। তবে কি? তবে কি?

তিনি আবার ঘুরে ছুটতে লাগলেন। দ্রুত আরো দ্রুত। শেষে পৌঁছলেন এমন জায়গায়, যেখান থেকে গীর্জাকে দেখা যায়, অন্তত, অস্তিত্ব আন্দাজ করা যায়।

না, গীর্জা ঠিকই আছে। দাঁড়িয়ে আছে অশরীরী দৈত্যের মত। দৈত্য নয়, ঈশ্বরপ্রেরিত দূতের মত। হয়ত' নদীগর্ভে ধ্বসে পড়ার আগে পাখা মেলে সে উড়েও যেতে পারে। ঈশ্বরের ইচ্ছা।

নিশ্চয় তবে কোথাও অনেকখানি মাটি ভেঙে পড়েছে। জলকে আলিংগন করার সময় ভাঙা মাটির আওয়াজে তিনি চমকে গিয়েছিলেন। তবে গীর্জার পবিত্র মাটি নয়, অন্য মাটি।

শহরে গুজব, পুণা থেকে, দিল্লী থেকে অভিজ্ঞ লোকেরা হাওয়াই জাহাজে করে উড়ে আসছেন। কেউ বলছেন, ওঁরা নদীকে দেখে এতদিনে চলেই গেছেন। রাজ্যের মন্ত্রী-উপমন্ত্রী কিংবা কেন্দ্রীয় রাজ্যসভা বা লোকসভার সদস্যেরা তো আগেই এসে দেখে গেছেন। এখন যাঁরা দেখতে আসছেন কিংবা এসে দেখে গেছেন, তাঁরাও সাধারণ লোক নন। পুণার সেচ গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টার, কেন্দ্রীয় জলবিদ্যুৎ কমিশনের সভ্য—ইত্যাদি গণ্যমান্য লোকের আগমনের কথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।

শহরে জোর গুজব, ওঁরা নাকি দ্বিতীয় কোন নতুন বাঁধের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আশান্বিত নন। অত বড় নদী। এ নদীকে শাসন করা বাতুলতা। এ শহরকে এবারে না হোক, আগামী কয়েক বছরে গ্রাস করবেই এ ভীমা নদী। নদীর ভেতরে খণ্ডে খণ্ডে জলাধার সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া, এ নদী বড় দুরন্ত। বাঁধন সে মানবে না। বাঁচবার একমাত্র পথ, নদী যদি অন্য ঢালে চলে।

লোকের মুখে মুখে গুজব আবার রটে গেল। তা হলে? এবারে মরব না, কিন্তু মরতেই হবে। দীর্ঘ-মেয়াদী মৃত্যুর মত।

শহরকে কয়েক বছরের জন্য অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেয়া গেল। আগের মত আবার নদীকূলে পাথর ফেলে ফেলে পিচিং-দেয়াল বড় জোর তৈরী হতে পারে। এর বেশি সরকার কিছু করতে হয়ত' পারবে না। আর সত্যিই যদি সরকার কিছু করতে না পারে।

"তবে?"

"তবে কি শহরের মৃত্যুই ভবিতব্য?"

"শহরের অন্তিমকাল উপস্থিত।"

"তবে সরকারের অন্তিমকালও উপস্থিত।"

লোকেরা রেস্তোরাঁয়, পথে, হোটেলে, আড্ডায় দাঁড়িয়ে এ-রকম

নানা মন্তব্য করতে লাগল। কয়েকজন লোক নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলতে লাগলেন যে, রাজ্যের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাবদ যে উনিশ কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার অধিকাংশ টাকাই তো সঞ্চিত হয়ে পড়ে আছে। খরচ করা হচ্ছে না কেন?

পথের মোড়ে উত্তেজিত হয়ে জটলা করছিল কলেজের ছেলেরা। ওরা বলছিল, সারা শহরের লোক সাধ্যমত নদী-শাসনের চেষ্টায় সরকারকে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু সরকার এখনো জনগণের সংগে সহযোগিতা করছে না কেন?

একটি উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক ছাত্র চীৎকার করে বললে—"একি চীনের হুয়াই নদী পেয়েছো যে, সরকার এসে জনগণের সাহায্য প্রার্থনা করবেন? জনগণ এগোলে অবশ্যই শহর বাঁচবে।"

ওদিকে শহরের এক কোণে যেখানে এক-কোমর বন্যার জল, সেখানে বিধবা-মায়ের সংগে খড়কুটোর ঘর দেখতে এসেছে কোন অসমীয়া কিশোর। মা দেখতে এসেছেন চাল ঠিক আছে কি-না। কেননা, চালের বাতার সংগে দড়িদড়া দিয়ে যথাসর্বস্ব বেঁধে গেছেন মা। আট-দশটা পুঁটুলি। ভরসা আছে যে, জল অতটা উঁচুতে উঠবে না। পুঁটুলিগুলি বেঁধে কিশোরের হাত ধরে মা অন্যখানে কয়েকদিনের জন্য চলে গেছেন। কোন নিরাপদ আশ্রয়ে।

সেখান থেকে আজ ঘর দেখতে এসেছেন।

পচা চালের বিকৃত গন্ধে বাতাস অসহ্য। কষ্টে বাতাস টেনে কিশোর বললে—"মা ভূমিকম্প হচ্ছে। কিছু কিছু যেন মাটি কাঁপছে।"

মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"তুই কদিন যে প্রায় না-খেয়েই আছিস। সেজন্য তোর মাথা ঘুরছে।"

কিন্তু হঠাৎ মা উৎকর্ণ হয়ে গেলেন। পাশের বড় পাকা

দোতলা বাড়িটায় বরাবর যেমন করে রেডিয়ো বাজে, ঠিক তেমনই রেডিয়ো বাজছে। ওদের দোতলা আছে, সুতরাং বন্যার সামান্য কোমর জলে পরোয়া নেই। ওরা বাড়ি ছেড়ে যায়নি।

কতদিন মা রান্না করতে করতে ঐ রেডিয়োতে গান শুনেছেন। শুনে উন্মনা হয়ে গেছেন। আজ শুনলেন, দুপুরের বাংলা-খবরে এই শহরের কথাই বলা হচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, তিনি যেন ভুল শুনছেন। শ্রীনেহরু, না, কার কথা যেন বলা হল? 'বন্যা শুধু সর্বনেশেই নয়। মংগলজনকও বটে।'

আর শুনতে পারলেন না। দপদপ করে উঠল মার কানের স্নায়ু। কী বলল ওরা? মংগলজনক? সে তো বটেই। তবে কার জন্য? যার দোতলা বাড়ি আছে এবং খাবারের অভাব নেই।

উপবাসে মাও দুর্বল। আর এমনিতেই গরীব। তদুপরি বন্যার ফলে এখন চালচুলো নেই। আস্তে আস্তে তিনি ছেলের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে পথের মোড়ে মিলিয়ে গেলেন।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন পাদ্রী। মুখে যেন তার ফেনা উঠছে। সর্বনাশের খবর। কাল যে ছিল, আজ সে নেই। একেবারে নিশ্চিহ্ন। রাক্ষসী খেয়ে সাফ করে দিয়েছে। তবু স্রোত চলছে তেমনি নির্বিকার। অতবড় গীর্জাকে বেমালুম উদরস্থ করেও।

অথচ কদিন নদীর জল কমছিল ক্রমাগত। পাদ্রী ভেবেছিলেন ঈশ্বরের কাছে প্রকৃতি পরাজয় মানতে বাধ্য। এবারে গীর্জাটা নিশ্চয় টিকে থাকবে। এ-যাত্রা অন্তত নদী পিছু হঠে যাবে। আব, সামনের বছর বর্ষা আসবার আগে গীর্জাটা ভেঙে অন্যত্র সবিয়ে ফেলা কঠিন ব্যাপার ছিল না।

কিন্তু সবুর সইল না প্রকৃতির। মানুষের পাপে পরিপূর্ণ বসুন্ধরা।

সেজন্য গীর্জাকে আত্মহত্যা করতে হল নদীর জলে। গীর্জাকে গ্রাস করেছে জলস্রোত। জল আবার ইতিমধ্যে কয়েক ফুট বেড়েছে। বৃষ্টি পড়ছে।

পাদ্রী বিস্ফারিত চোখে নদীকে দেখতে লাগলেন।

মগজে ঘুরপাক খেয়ে গেল, মেমের সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা। নদীকে মনে হতে লাগল সংহারিণী—বাইবেলের মহাপ্লাবনের কাহিনী তাঁর স্মরণ হল। সেই যে, মহাপ্লাবনের দিনে Noah's Ark বলে নৌকাটি ভেসে এসেছিল। তাতে চড়ে জীবজগৎ মহাপ্লাবনেব করাল গ্রাস থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

আজো যেন সামনে সেই বন্যা। সেই পারাপারহীন নদীর রূপ সামনে। কিন্তু সে নৌকা কই ?

পাদ্রীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। একশ বছরের পুরোন একটি মহৎ সৌন্দর্যকে নষ্ট কবে দিল নদী। পুণ্যস্থান বলে গীর্জাকে বেহাই দিল না।

তবে কি এ-শহরের ধ্বংস অনিবার্য ? মেঘে ঢাকা সূর্যের দিকে চেয়ে পাদ্রী প্রশ্ন কবলেন আলোকে ? ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি আলো। কিন্তু এ-শহরের উপর আলোও যে দিনেব পর দিন কমে আসছে। পাদ্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

রিপোর্টার

॥ বার ॥

পথ-চলার কাহিনী আপাতত বন্ধ রাখি।

কেননা, বিপুলা পৃথিবীর কোটি কোটি পথের কোন পথই আমি জানিনে। আমি কোন পথই যে ঘুরিনি।

সুমেরু আর কুমেরু বিন্দুর মাঝখানে কত কোটি কোটি পথ। কত ছবির মত শহর, কত সবুজ গ্রাম, নীলকান্ত হ্রদ, পীতবর্ণ নদী, বাসন্তী রঙের অরণ্য।

উত্তর প্রদেশের চন্দনচৌকী থেকে বেরিয়ে পাখীর মত উড়ে চলুন উত্তর মহাসাগরের তীরে তীরে। ঘুরে আসুন ইউরোপের তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে বেরিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সব পথ জড়ানো। তরুণের দ্বীপ ত্রিনিদাদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শহর মেক্সিকো।

আচার, আচরণ, চলনের নানা মশলা দিয়ে গড়া পৃথিবীর জনপদগুলি। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস হচ্ছে মানুষের ভালবাসা। সে-ভালবাসা গুল্মে ফুল ফোটায়, স্টেপ অঞ্চলে ফসল ধরায়, মরুভূমিতে তূলো বোনে। সে ভালবাসার যেখানে অভাব, সেখানেই হিংস্রতা, যুদ্ধ, অশান্তি।

কল্পনা করতে আমারই আবেশ আসে। তবু আপনি কল্পনা করুন, হাওড়া স্টেশন থেকে রেলগাড়ীতে শনিবারে গাঁয়ে ফিরছেন। কিছুক্ষণ চলার পর দেখলেন, আপনার গাড়ীর কামরা, গাড়ীর যাত্রী যাত্রিনী, মায় বাইরের দৃশ্যপট সব পাল্টে গেছে। আচম্কা-আবির্ভূতা

শ্বেতাংগিনী আপনার কোন সহযাত্রিনীকে জিগগেস করলেন যে, আপনি কোথায় এলেন।

তিনি সবিনয়ে বললেন---"গাড়ী আল্পস্ পর্বতমালার পাশ দিয়ে যাচ্ছে।"

জানলা দিয়ে ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, অদূরে কোন হ্রদের মত এক জলাশয়ের নিস্তরংগ জলে হাঁসের মত চাঁদ ভাসছে। তবে রাত হয়েছে। আল্প্সের পাদদেশে ফুলে-ঢাকা সমতল জমি থেকে অপরিচিত গন্ধ হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

আপনার ফি শনিবারে ঘরে-ফেরা কেরানীর জীবনে খুশির জোয়ার লাগবে। ড্যালহৌসী স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে এশিয়া অতিক্রম করে আপনি জেনেভা হ্রদের তীরে গিয়ে পৌঁছেচেন। সে মৌতাত করেই হোক, আর পকেটের পয়সা খরচ করেই হোক। কিংবা, বই পড়ে কল্পনার জাল বুনেই হোক।

কিন্তু আগেই বলেছি, পথ চলার কাহিনী আপাতত বলবনা।

তার চাইতে এক আজব শহরের গল্প বলব। যে-শহরের অবস্থান সমুদ্র থেকে কিছু দূরে এক নদীর তীরে। শহরের নাম আমি করব না। সমুদ্র থেকে কিছু দূরে এবং এক নদীর তীরে কত শহরই না আছে। যেমন, টেম্সের তীরে লণ্ডন, টাইবারের তীরে রোম, ইরাবতীর তীরে রেংগুন।

সেই আজব শহরে এক প্রকাণ্ড সংবাদপত্রের অফিস। সেখানে রাহুল রিপোর্টারের চাকরি করে। আর রাহুল নিজেকে ধন্য মনে করে এই ভেবে যে সে, এমন একটি অফিসে ঢুকেছে, যেখান থেকে দেশের জনমত পরিচালিত হয়। এবং তাও কলমের জোরে, তলোয়ারের জোরে নয়।

সেই আজব দেশের নিয়ম এই যে, যাঁরা মহৎ কাজ করেন, তাঁদের মাইনে অল্প। অধ্যাপক, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতির বেতন বড় অল্প। এত অল্প যে, ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিন কোন সহৃদয় ভদ্রলোক এদেশে বেড়াতে এসে ওদের মাইনের কথা শুনে চমকে যান।

রাহুলের মাইনেও অল্প। তাতেও রাহুল সন্তুষ্ট। সরস্বতী আর লক্ষ্মীর বিবাদের কথা শিশুকাল থেকেই সে শুনে এসেছে। সুতরাং স্বল্পেই সে সন্তুষ্ট।

কিন্তু ঘরের অসন্তুষ্টা স্ত্রীকে বাগ মানাতে কষ্ট হয়। স্ত্রী বুঝতে চায়না, অর্থের চাইতে যে আদর্শ বড়। স্ত্রী বলে, শোষণের ফন্দি যারা করে, এসব তাদের বানানো কথা।

কিন্তু স্ত্রীর বলাবলির ধার রাহুল ধারে না। অতএব, স্ত্রী আর কি করবে? আটপৌরে শাড়ি পরে অন্ধকার-খুপরিতে কালো মুখ করে বসে থাকে।

স্ত্রী অনুভব করে, মোহর অর্থাৎ মুদ্রার একটা আলো আছে। শিশুর মুখ দেখতে তাই প্রাচীন ভারতে মোহরের রেওয়াজ ছিল। যেমন আজকাল, নেতাদের মুখ দেখতে সভাসমিতিতে টাকার তোড়া এগিয়ে দেয়া হয়।

উনিশশ' চল্লিশ সাল থেকে উনিশশ' পঞ্চাশ সালের মধ্যে ভারতে, পাকিস্তানে, বর্মায়, সিংহল প্রভৃতি দেশে ঘটা করে যখন স্বাধীনতা উৎসবের মত একটা কিছু উৎসব অনুষ্ঠিত হল, তখন তার আজব শহরেও স্বাধীনতা উৎসব উদ্‌যাপিত হল।

পথে কত জ্বলল আলো, কত বাজল বাজনা, কত উড়ল নিশান, কত ঝরল গোলাপ জল। ধনীরা পয়সা খরচ করে বাইজী নাচালেন ঘরে। মোসাহেবেরা বাগানবাড়ীতে মদ খেলেন।

একটা বিশেষ পরিবর্তন যে উপরে উপরে হয়ে গেল, রাহুল তা

অনুভব করল। কিন্তু রাহুলের স্ত্রীর কাছে তা' ধরা পড়ল না। পুরুষের হৃদয় চলে হুজুগে, আর নারীর হৃদয় চলে যুক্তির তালে। স্ত্রী বললে, এ আবার কি স্বাধীনতা? আমাদের ফুটো সংসারে স্বাধীনতার মৌচাক থেকে কোন মধুই যে ঝরছেনা!

রাহুল বললে, সবুর কবো। সবুরে মেওয়া ফলবে।

হাঁ, রাহুল তার স্ত্রীকে করুণা করে। গোটা স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তার ধারণা ভারতীয় সাংখ্য দর্শনের মতই। পুরুষ চক্ষুষ্মান, কিন্তু স্ত্রী অন্ধ। অন্ধ বলেই ওঁরা বাস্তববাদিনী। ওঁদের কল্পনাশক্তির বড় অভাব। তাই ওঁদের মধ্যে গল্পলেখিকা ভালোই আছেন, কিন্তু তেমন বড় কবি নেই। ওঁরা পার্লবাক হতে পারেন, কিন্তু টেগোর হতে পারেন না।

স্বাধীনতার মাহাত্ম্য স্ত্রীকে বোঝাতে না-পেরে এক একদিন রাহুল মনে মনে চটে যেত। মনে মনে ভাবত, স্বাধীনতা সম্পর্কে অবিশ্বাসিনী স্ত্রী কী সাংঘাতিক বস্তু। কিন্তু ধনীর স্ত্রীরা তো এ-ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন না। তাঁরা স্বাধীনতার স্বাদ তবে আগেভাগেই পেয়েছেন? ওদের বিয়ে বাড়িতে, গাড়িতে, অলিন্দে সব উৎসবেই যে জাতীয় পতাকা উড়ছে। কই, তেমন পতাকা তো গরীবের বস্তিতে, উদ্বাস্তুর উপনিবেশে উড়ানো হচ্ছে না।

নিজের মনে মনে রাহুল কঠোর হয়ে ওঠে। ভাবে, শহরে ঢোল পিটিয়ে দিলে কেমন হয়? স্বাধীনতা সম্পর্কে যারা অবিশ্বাসিনী, তাদের সমুচিত দণ্ড দেয়া হবে। আবার নিজের মনে মনেই সে নিজের সমালোচনা করে। তাহলে তো ডিক্টেটরী হয়ে যায়। তাহলে যে একেবারে মুঘল আমলে গিয়ে ঠেকা যায়।

মনে মনে রাহুল তর্ক করে। প্রায় দুশো বছরের ইংরাজ আমল অতিক্রান্ত হল। দুশো বছরের অন্ধকারে যাদের পিতা-পিতামহের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরও চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার

কথা। স্বাধীনতার উষা কি করে ওরা অনুভব করবে? তবে, দিনের আলো ক্রমে প্রখর হলে ওরা বুঝবে যে সত্যিই উষা এসেছিল।

স্ত্রী তর্ক করে—"তবে কি মুঘল বা পাঠান আমলে ভারতীয়েরা স্বাধীন ছিল? জারের আমলে রাশিয়ার, চিয়াং-এর আমলে চীনের জনসাধারণ স্বাধীন ছিল?"

নির্ভীক সংবাদপত্র সেবী হিসেবে রাহুলের শিরদাড়া খাড়া হয়। জিগগেস করে—"তুমি কী বলতে চাও?"

স্ত্রী বলে—"স্বাধীনতা বলতে আমি জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বুঝি।"

রাহুল পাল্‌টা প্রশ্ন করে—"তবে কি আমাদের নেতারা স্বাধীনতা বলতে ভুল বুঝেছেন?"

স্ত্রী হেসে ফেলল। বললে—"পরের কথা কেন বলছ? সংবাদ-পত্রের রিপোর্ট করতে করতে কি নিজের স্বাধীন চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছ?"

ঠিক যখন তর্ক চলছিল, তখন নিজের কপালে করাঘাত করতে করতে একটি লোক ভিক্ষের জন্য ওদের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সে বললে, সে উদ্বাস্তু-কলোনী থেকে এসেছে। তিনদিন পরে ছ'পয়সা যোগাড় করতে পেরে আজ সে ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। ঐ ছ'পয়সায় সে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পরনের কাপড়খানি ভাড়া করে এনেছে। সন্ধ্যের মুখে ঐ কাপড় অবশ্য ফিরিয়ে দিতে হবে। গত ছ'দিন সে ভিক্ষেয় বেরোতে পারেনি। আজ ভিক্ষে কিছু পেলে ঘরের পোষ্য-স্ত্রী ও কন্যাকে গিয়ে খড়কুটো কিছু আহার্য দেবে।

রাজবাড়ির তোরণে যেমন থাকে নহবৎ-মঞ্চ, রঙীন কাপড় দিয়ে তেমনি নহবৎ-মঞ্চ সাজানো হয়েছে। ময়দানে বিরাট সভার

তোড়জোড়। বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে ময়দানের উপর এক ত্রিতল অট্টালিকা খাড়া করা হয়েছে। আজ ঐ অস্থায়ী-অট্টালিকার চূড়া থেকে ভাষণ দেবেন এক বড় নেতা।

ময়দানের ঘাসের বুকে রাহুল ঘুর ঘুর করে ঘুরছে। হাতে পেন্সিল আর নোট বুক। লক্ষ্য করছে, কোনদিকে নেতা আসেন। শাদা জমির ওপর লালপেড়ে ফর্সা শাড়ি পরে স্বেচ্ছাসেবিকারাও ঘুর ঘুর করে ঘুরছে এদিকে ওদিকে।

রাহুলের দৃষ্টি বাজপাখীর মত। এধারে ওধারে ছোট ছোট রোমান্টিক ঘটনাও সে লক্ষ্য করছে। হবু ছোট ছোট নেতারা স্বেচ্ছাসেবিকাদের সংগে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছেন। ছোট ছোট নেতার হাতের গোলাপ ফুল কখন যে কোন স্বেচ্ছা-সেবিকার খোঁপায় গিয়ে উঠছে, রাহুল তা লক্ষ্য করছে।

অবশেষে নেতা এলেন। নেতা বক্তৃতা দিলেন। রাহুল সেই নেতার ভাষণকে দাড়ি, কমা, সেমিকলোন মিলিয়ে টুকে নিল। বারংবার তথ্যের ওপর জোর দিয়ে নেতা বলছেন যে, সাচ্চা আজাদি মিলেছে।

সভা যখন সাংগ হল, তখন খবরের কাগজের অফিসে পৌঁছে সেই খবর সাজিয়ে লিখে দেয়ার পালা। পরদিন কাগজে সে খবর বেরোবে। রাহুল অফিসের দিকে ছুটল।

রিপোর্ট তৈরী করতে বসে প্রথমে খটকায় পড়ে গেল রাহুল। সভায় কত লাখ লোক হয়েছিল? পাছে অনুমানটা ভুল হয়, সেজন্য অন্য একটি দৈনিক কাগজের অফিসে সে টেলিফোন করে জানতে চাইল, সভায় কত লোক হয়েছে।

টেলিফোনের অপর দিক থেকে জবাব এল—"আমাদের কাগজে চার লাখ লোকের কথা লিখছি।"

রাহুল তখন রিপোর্টে লিখল ঃ

"গতকল্য চারিলক্ষ জনতার এক বিপুল সমাবেশে…"

এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল। সরকারী দপ্তরখানার প্রচার-বিভাগ থেকে অনুরোধ করা হল যে, জনতার সমাবেশকে যেন ছ'লক্ষের হিসেবে ফেলা হয়।

অগত্যা রাহুল রিপোর্টে লিখল ঃ

"গতকল্য ছয়লক্ষ জনতার এক বিপুল সমাবেশে…"

আবার বেজে উঠল টেলিফোন। কি ব্যাপার ? রিপোর্ট লেখা আর এগোচ্ছে না। টেলিফোন এসেছে আরো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে। জনতার সমাবেশকে যেন আট লক্ষের হিসেবে ফেলা হয়।

রাহুল খানিকটা বিরক্তিবোধ করছে বৈকি। তবুও রিপোর্ট লিখে দিতে হবে।

শেষে সে লিখল ঃ "গতকল্য আট লক্ষ জনতার এক বিরাট সভায়…"

মস্ত বড় রিপোর্ট লেখা শেষ করে রাহুল যখন বাড়ির দিকে চলল, তখন আকাশের চাঁদ হেলে পড়েছে।

আজব শহরের পথ ঘাট নির্জন। শহরের ট্রাম-বাস কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পায়ে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে সে যখন বাড়িতে পৌঁছল, তখন তার চোখ অন্ধকারে আলো দিচ্ছে। সেই আলোর সাহায্যে অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে উঠল।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলল স্ত্রী।

জামা-কাপড় খুলতে খুলতে রাহুল তার স্ত্রীর কাছে মহান নেতার বর্ণনা দিতে শুরু করেছিল।

কিন্তু স্ত্রী যেন ঘুমেই ঢুলে পড়ছে। বরফের মত ঠাণ্ডা ভাত

ডাল দিয়ে গিলতে গিলতে রাহুল জিগগেস করে—"তুমি কি স্বাধীনতার নামে কোন প্রেরণাই পাওনা ?"

সহজ কণ্ঠে স্ত্রী বললে—"প্রেরণা পেতাম, যদি তুমি লোককে ফাঁকি না দিতে।"

ভাতের গ্রাস মুখে আর তোলা হলনা। রাহুল অবাক হয়ে শুধাল—"আমি ফাঁকি দিয়েছি ?" সংগে সংগে তার মনে পড়ে গেল, কেমন করে চার লক্ষ লোককে সে আট লক্ষ লোক বানিয়ে এসেছে। একজন বিশেষ নেতার সম্মান প্রদর্শনের জন্যই তো একটু আগে তার রিপোর্টে কিছুটা ফাঁকির খাদ মিশিয়ে দিয়ে এসেছে।

স্ত্রী বললে—"বাড়ি-ভাড়া দু'মাসের বাকী পড়েছে। আজ সন্ধ্যেয় এক মাসের বাড়ি-ভাড়া নিয়ে যাবার জন্য তুমি মেয়াদ করেছিলে। লোকটা এসে তোমাকে না-পেয়ে আমাকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে গেছে।"

করুণ কণ্ঠে রাহুল বললে—"অফিসে বোনাস পাব পাব শুনেছিলাম। সেই আশায় আজ এসে একমাসের বাড়ি-ভাড়া নিয়ে যাবার জন্য বাড়িওলাকে লোক পাঠাতে বলেছিলাম। কিন্তু বোনাস তো আমি পাইনি। কাজেই তোমার হাতে ভাড়ার টাকা রেখে যেতে পারিনি।"

রাহুল ঠাণ্ডা-ভাতের উপর জল ঢেলে দিল। আর ভাত খাওয়া হলনা। অবশ্য, এমনিতেই সে জল ঢালত। রোজরোজই ঠাণ্ডা ভাত খেতে হয়। আজ আরো দীর্ঘ রিপোর্টের জন্য বেশি রাত হয়ে গিয়েছিল।

রিপোর্টার রাহুল সেই আজব শহরের প্রাদেশিক আইনসভার ভেতর গ্যালারিতে বসে রিপোর্ট নিচ্ছে। কিন্তু কী যে রিপোর্ট নেবে।

বাইরে জনসাধারণের কোলাহল ক্রমেই বাড়ছে। সরকারী নিষেধ অমান্য করে আইনসভার বাইরে প্রধান ফটকের সামনে জনতার ভিড় বাড়ছে।

আইনসভায় ঢোকার সময়ই রাহুল অলক্ষণের আভাস পেয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত মানুষগুলি সরেও পড়তে পারে। কিন্তু ক্রমেই দেখা যাচ্ছে, লোকগুলির জিদের অন্ত নেই। তারা যা শ্লোগান দিচ্ছে, তাতে ভিত কাঁপছে পাথুরে প্রাসাদের।

কি হয়, না জানি কি হয়। তবে ভরসা এই যে, প্রাদেশিক আইনসভার যিনি নেতা, তিনি ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন করে এসেছেন নিজেই। সুতরাং, আইন-অমান্য আন্দোলনের গুরুত্ব তিনি বোঝেন।

আহা, এই অহিংস নেতার সংগে কতদিন রিপোর্ট করতে বস্তিতে বস্তিতে রাহুল ঘুরেছে। আজব-শহরের প্রাসাদগুলির পেছনে সর্বত্র বস্তি ছড়িয়ে আছে। শহরের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে কত বস্তিই না আছে। ঐ বস্তিগুলোতে প্রায় দশ-বারো লক্ষ গরীব বাস করে।

প্রাদেশিক আইনসভার যিনি আজ নেতা, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী, তিনি গদি আরোহণ করে প্রথমেই চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধে যেমন জেহাদ ঘোষণা করেছেন, তেমনি বস্তির দারিদ্র্যের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

এমন একজন নেতার পেছনে কে কাদের উস্‌কে দিয়েছে বলেই না আজ এই আইনসভার বাইরে এত গোলমালের সূচনা।

রাহুল মনশ্চক্ষে দেখতে লাগল, প্রধান ফটকের সামনে ক্রমেই ভিড় বাড়ছে। ভিড়ের লোকগুলির চেহারা ক্ষুধার্ত লাগলেও আসলে ওরা ক্ষুধার্ত নয়। তবে অসন্তোষের আগুনে ওরা ধিকি ধিকি জ্বলছে।

কেন এসেছে ওরা? ওরা কোন বিশেষ আইনের প্রত্যাহার চায়। ওরা বলছে, এ আইন ওরা পাশ করতে দেবেনা। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের বিক্ষোভ জানাতে এসেছে।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জানেন যে, তিনি যা কিছু করেন, দেশের মংগলের জন্যই করে থাকেন। নেতাব বুদ্ধি জনতার বুদ্ধির অনেক উপরে।

রাহুল উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল দূ .গত হুংকারের মত মানুষের একত্রিত আওয়াজ। কী জানি কী হয়।

মুখ্যমন্ত্রী নিজেই চেয়ারে বসে অস্থির হয়ে উঠছেন। অস্থির হবার কারণ, লোকগুলি মুখ্যমন্ত্রীর দর্শন লাভ করতে পারছেনা। তারা পুলিশ আর সার্জেণ্টেব প্রতাপে ফটকেব বাইবে আটকা পড়ে গেছে। ওরা ঘন ঘন চীৎকার দিচ্ছে "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়।"

সহসা রাহুল লক্ষ্য করল, মুখ্যমন্ত্রী উঠে বাইরে যাচ্ছেন। রিপোর্টাবের গ্যালারিতে গুঞ্জন উঠল। সভার অধিবেশন কিছুক্ষণের জন্য মুলতুবী রাখা হয়েছে।

বাইরে ছুটে এল রাহুল। এসে একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছাকাছি দাঁড়াল। মুখ্যমন্ত্রীর চোখে মুখে কী উত্তেজনা। ফটকের বাইরে উত্তেজিত জনতার দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলতে লাগলেন, তিনি যা করছেন, দেশেব মংগলের জন্যই করছেন।

কিন্তু কার কথা কে শোনে? সম্ভবত ফটক পর্যন্ত এগোবার আগেই জনতা কয়েকবার পুলিশের টিয়ার-গ্যাস খেয়ে এসেছে। কাজেই তারা উত্তেজিত।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। রাহুলের দিব্য চক্ষে ভাসতে লাগল পতনোন্মুখ জারের প্রাসাদের ছবি। ছবিটি সে কোন এগজিবিশনে

দেখে এসেছে। একদিকে ক্ষুধার্ত ঝাঁক ঝাঁক মানুষ। অন্যদিকে পালিশ, পরিচ্ছন্ন, শস্ত্রপাণি-প্রাসাদ রক্ষীরা।

রাহুল তাকাল মুখ্যমন্ত্রীর দিকে। উত্তেজনায় তিনি কাঁপছেন। জনতা কোনমতেই বাগ মানতে চাইছেনা। তিনি টিয়ার-গ্যাসের আদেশ দিলেন।

মুহূর্তে দুঃসহ-গন্ধে এবং ধোঁয়ার আবরণে বাতাস বিকৃত হল। ঝাঁকঝাঁক টিয়ার-গ্যাস ফাটছে। জনতা বসে পড়েছে রাস্তার পাষাণের উপর।

কিন্তু জনতা দমবার নয়। তাদের অনেকেই ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। টিয়ার-গ্যাসের গুলী পাথরে পড়ে ফাটবার আগেই ক্ষিপ্রহস্তে আবার ওরা গুলীগুলো পুলিশের দিকে ফিরিয়ে দিতে লাগল। সম্ভবত ওটাকেই ওরা আত্মরক্ষার উপায় বলে মনে করল।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু পুলিশের মাঝখানেই ছিলেন, তিনি সম্ভবত ভাবলেন, জনতা তাঁকেই তাগ করছে। ভয়ে তিনি পশ্চাদপসরণ করে থামের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

কিন্তু এ লড়াইয়ের শেষ কোথায় ?

মুখ্যমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত শস্ত্রপাণিদের অনুরোধে সত্যিকারের গুলী-চালনার নির্দেশ দিলেন। নকল গুলী থেকে এবার আসল গুলী।

ঝাঁক ঝাঁক ছুটল গুলী। মানুষকে হত্যা করার জন্য গুলী। মুখ্যমন্ত্রী চেয়ে দেখতে লাগলেন। পথের উপরে অপরিচিত মানুষগুলির চোখ মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। ওদের পালাবার পথ নেই। চারদিকে প্রাসাদ। প্রাসাদগুলির সমস্ত দরজা বন্ধ। পালাবার সমস্ত পথকে নিশানা করে গুলী ছাড়া হচ্ছে।

মানুষের প্রাণ-পায়রা লক্ষ্য করে এমন ঝাঁক ঝাঁক গুলী জালিয়ানওয়ালা বাগেও হয়েছিল। সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী সে-দৃশ্যের কথা কল্পনা করতে লাগলেন।

রাহুলের মনে ফাটল ধরেছে। তবু ফাটল সে জোড়া দিতে চায়। ভাবে অন্যান্য দেশের কথা। সে শুনেছে, স্বাধীনতার পরের অবস্থা কোন কোন দেশে নাকি দুঃখের হয়েছে। ঠিক, দুঃখের বললে ভুল হবে। দুঃখ-বরণের হয়েছে। কিন্তু আত্মকৃচ্ছ্র তার দুঃখ-বরণকেও ঐ দেশের জনসাধারণ হাসি মুখে মেনে নিয়েছিল।

দুঃখের কথা মনে উদয় হলেই নিজের স্ত্রীর করুণ মুখখানি মনে হয়। স্ত্রী প্রায়ই দুঃখ করে আর বলে, সে আরও পঞ্চাশ বছর পরে জন্মালে এমন দুঃখ পেতনা।

রাহুল স্ত্রীকে বোঝাতে ত্রুটি করেনি যে, ওর চাইতে সহস্রগুণ দুঃখী আজব শহরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। ক্ষয় রোগে নিভন্ত যে-শিশু, উপবাসে মলিন যে-বধূ, হাজার চেষ্টায় বিফল-মনোরথ যে-বেকার, তাদের সংখ্যাতীত দীর্ঘশ্বাসে আজব শহরের বায়ুমণ্ডল অদ্ভুত ভাবে গুমোট আজো।

স্ত্রী বোঝেনা। শিশু-রাষ্ট্রের অবস্থাটা সে বুঝতেই চায় না। বরঞ্চ বিদ্রূপ করেই বলে—"দশ বছর পরেও দেখে নিও, তোমার রাষ্ট্র শিশুই আছে। জনসাধারণের দুঃখ যেমনি আছে, তেমনিই থাকবে।"

রাহুল বলে—"কিন্তু প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা পূর্ণ হোক। তখন দেখে নিও।"

স্ত্রী বলে—"কাগজে-কেতাবে পরিকল্পনার মাহাত্ম্য বুঝিনে। চোখের সামনে যদি দেখতে পাই, দেশে বেকার কমে গেছে, রোগ

সয়ে গেছে, অশিক্ষা উবে গেছে, লোকের স্বাস্থ্য-শ্রী ফিরে এসেছে, তবে বুঝব, হাঁ, সত্যিই কিছু হয়েছে।"

রাহুল স্ত্রীকে বোঝাতে পারে না। কি করেই বা বোঝাবে? তার স্ত্রী যে বাস্তববাদিনী। স্বামীর মত কল্পনা-প্রবণতা তার নেই।

কিন্তু একটা জিনিস রাহুল সহ্য করতে পারে না। সেটা হল, গুলী। গুলীবর্ষণ যেন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সে নিজেই একদিন প্রায় গুলীর শিকার হয়েছিল। পুলিশ সম্ভবত জনতাকে পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছিল। কিন্তু ভিড়ের কোলাহলের মধ্যে সেসব সাবধান বাক্য শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তাই সে সরে যেতে পারে নি। এবং গুলী খেতে খেতে বেঁচে গেছে।

সেই ইংরাজ আমলে যেমন প্রাণের মূল্য ছিল না, তেমনি প্রাণের মূল্য আজো নেই। অথচ স্বাধীনতার সনদে প্রথম কথাই হচ্ছে বাঁচবার অধিকার। সে অধিকার কোথায়? দ্বিতীয় অধিকার হচ্ছে বলবার অধিকার। সে অধিকার কোথায়?

লোকটা গলা টিপে ধরেছে।

রাহুলের গলা টিপে ধরেছে লোকটা। কোন মতেই শ্বাস নিতে পারছেনা রাহুল। কোন শব্দোচ্চারণেরও ক্ষমতা নেই। ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে শরীর।

খুনে লোকটার সম্বিৎ ফিরে এল। হঠাৎ অনুভব করতে পারল যে, খবরের কাগজের রিপোর্টারকে সে প্রায় খুন করে ফেলছে।

তৎক্ষণাৎ সে রিপোর্টারকে ছেড়ে পালাতে শুরু করল। আর লোকটার হাতের বজ্র-বেষ্টনি শিথিল হতেই রাহুলও ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। জ্ঞান আছে, কিন্তু উত্থান-শক্তি নেই রাহুলের।

আকাশের সূর্য তখন যাই যাই! আজব শহরের সেরা প্রাসাদ-গুলোর চূড়োয় তখন সূর্যের গাত্র-হরিদ্রার শেষ ছাপ। শুয়ে শুয়ে রাহুল শুনছে জনতার হুড়োহুড়ির শব্দ। কারা পালাচ্ছে? কারা তেড়ে আসছে? রাহুলের উঠবার শক্তি নেই।

এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট। রাহুল অনুভব করল, কার হাতের স্পর্শ যেন। অবশ ভাবে তাকিয়ে দেখল, সেই খুনীই ফিরে এসেছে।

খুনীর মুখ এবারে মমতায় ভরা। আগের মত পৈশাচিক নয়। রাহুলকে চোখ মেলে চাইতে দেখে লোকটি বললে—"আমাকে ক্ষমা করুন। অতটা শাস্তি আপনাকে দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না।"

অস্ফুটকণ্ঠে রাহুল শুধালে "আপনি কে?"

খুনী লোকটি বললে—"আমি একজন শিক্ষক। গুণ্ডা নই, বাটপাড় নই।"

"আমার শ্বাসরোধ করছিলেন কেন?" রাহুল শুধাল।

লোকটির মুখমণ্ডলে আবাব একটা দৃঢ়তা ফিরে এল। দাঁত দিয়ে ওষ্ঠাধর চেপে বললে—"আপনি নিতান্তই শুনতে চান?"

রাহুল উত্তরে সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল।

লোকটি বলল—"প্রতিদিন প্রতিটি খবর পথ থেকে আপনারাই সংগ্রহ করেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, বিষয় যা ঘটে, অনেক সময় আপনারা তার উল্টো খবর দেন। তাছাড়া, আপনাদের কাগজের সম্পাদকীয় অনেক সময় জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে যায়। কাগজেব কাউকে যখন সামনে পাচ্ছিনে, অথচ আপনাকে সামনে পেয়েছি, তখন বহুদিনের ইচ্ছাকে সার্থক করেছি।"

রাহুল শুধাল—"আপনি কি জানেন না যে, খবর-রচনা করার ব্যাপারে কাগজগুলির নিজস্ব পলিসি থাকে?"

লোকটি বলল—"অত ভাববার সময় ছিলনা। হঠাৎ মনে হল, আপনাকে কিছু শিক্ষা দিয়ে যাই।"

রাহুল শুধাল—"যেতে যেতে আবার ফিরে এলেন কেন ?

লোকটি এবার রাহুলের পাশে বসেই পড়ল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মত। চেহারাখানি অভাবগ্রস্থ শিক্ষকের মতই। ওর কণ্ঠের ডান দিকের নীল শিরা কথা বলতে বলতে বারবার যে অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে উঠে, তা সম্ভবত অতিরিক্ত টুইশানির জন্য।

লোকটি বলল—"আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। সহসা রাগের মাথায় যা' করেছি, তার জন্য আমি অনুতপ্ত।"

এমন সময় হৈ হৈ করতে করতে পুলিশের একজন সাব-ইনস্পেক্টার ছুটে এলেন। যিনি এলেন রাহুল তাঁকে চেনে।

তিনি বললেন—"আমি দূর থেকে সব লক্ষ্য করেছি। একে আমি থানায় নিয়ে যেতে চাই।"

লোকটির চোখ করুণ হয়ে এল। সম্ভবত থানায় রাত্রি-যাপনের এক নিষ্ঠুর ছবি তার মানসপটে শিক্ষকের কবি-কল্পনায় রঞ্জিত হল। লোকটি রাহুলের হাত চেপে ধরল।

রাহুলের শক্তি ক্রমেই ফিরে আসছিল। ততক্ষণে সে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে পুলিশ-অফিসারকে বলল—"আমি বলছি, ইনি আমার বন্ধু। একে ছেড়ে দিন।"

পুলিশ-অফিসার লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে অন্য দিকে চলে গেলেন। সম্ভবত তিনি খুব বিস্মিত হয়েছিলেন।

রাহুল লোকটিকে বলল—"আপনি সরে পড়ুন। দেখছেন না, রাস্তার থমথমে ভাব। আমিও চলি। মিছিল তো ভেঙেই গেছে।"

দিনের পর মাস গেল গড়িয়ে। বছর ঘুরল।

রাহুলের সাংসারিক অভাব মিটল না। মনের দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত রাহুলের সাংবাদিক বৃত্তির কি হল, নাই বা শুনলেন।

তবে জেনে রাখুন, তার চাকরি গেল। কিংবা নিজেই চাকরি ছাড়ল।

সে ভয়ানক দিনগুলোর ছবি আঁকবার মত নয়! এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় নাম লেখালেই এদেশে চাকরি পাওয়া যায় না। চাকরির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নেই যেখানে, সেখানে চাকরি কি করেই বা দেবে সরকার?

স্ত্রীর চোখের অন্ধকারের উপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে এসে রাহুল গয়নাগুলো বেচতে শুরু করল। অনুভব করল, পেছনের দরজা দিয়ে অন্ধকারে আরও মানুষ আসে। বিবেক আছে, অথচ নিরুপায়। এমন কতশত মানুষ অন্ধকারে খিড়কির দরজা দিয়ে স্যাঁকরার দোকানে আসতে বাধ্য হয়।

বেকার জীবনে বৈরাগ্যের ডাক আসে। পথচলার নেশা পেয়ে বসল রাহুলকে। আর যোগাযোগ হয়ে গেল।

চলল সে আজব শহর ছেড়ে। একদিন ট্রেনে উঠে সে গুড-বাই করল আজব শহরকে। ক্রমেই মিলিয়ে গেল পরিচিত শহরের পুলের শেষ চূড়া। মুখ গুঁজে বসে রইল গাড়ীতে সে। আর এক নতুন জীবিকা তাকে হাতছানি দিয়েছে। এবার সংবাদপত্রের পুরুষানুক্রমিক সেই জমিদারির গদিতে আর মুহুরিগিরি নয়।

সেই রাহুল আজো পথে ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে সে গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী পেরিয়ে যায়। কিংবা মনে মনে কাবুল কান্দাহারের পথে, খোরাশান, বাদকশানের পথে সমরকন্দের দিকে চলে।

শিশুরাষ্ট্রের বয়স তো কম হল না। কিন্তু পরিবর্তন এল কোথায় ?

সে পৃথিবীর ভূগোল উলটায়, ইতিহাস উলটায়। লক্ষ্য করে যে পৃথিবীর বহুদেশ জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের রেসের ঘোড়া আগেই বাজী জিতবে। কিন্তু তার আজব দেশের ঘোড়া চলছে বিলম্বিত লয়ে। এবং ঘোড়া যে কবে কোথায় পৌঁছুবে, তাও ঠাহর করা যাচ্ছে না।

কিন্তু তবু দেশপ্রেমিক রাহুল আশার আলো জ্বালিয়ে বসে আছে। তার আজব দেশের জনগণ নিশ্চয় একদিন লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া সে সামনে মেলে ধরে বসে আছে। সে অনুভব করছে, কোথায় যেন আশার ক্ষীণ আশাবরী রাগিনী বেজে উঠেছে।

কিন্তু আশার রাগিনী বেজে উঠেছে বলেই জনগণ আত্মসন্তুষ্ট হয়ে গেলে চলবে কেন ? জনগণকেই অক্লান্তভাবে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে হবে দেশকে।

রাহুল লক্ষ্য করে, তার দেশের জনগণ সজাগ হয়ে উঠছেন। তার দেশের অষ্টম-বার্ষিকী পনেরই আগস্ট উপলক্ষ্যে দেশের আত্মসন্তুষ্ট কংগ্রেসী নেতারা যেখানে ঢালাও আনন্দোৎসবের আয়োজন করেছেন, সেখানে কিন্তু সচেতন জনসাধারণ দাঁড়িয়ে নেই। তাঁরা সেদিন গোয়ার মুক্তিসংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন করতে দলে দলে গোয়ার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছেন। অর্থাৎ জনসাধারণ এগিয়ে যাচ্ছেন। এবং জনসাধারণকে যে এগিয়ে যেতেই হবে। জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টিই তো রাষ্ট্রের চাকাকে ঠিক পথে চালিত করবে। চালিত করবে নেতাকে।

আজব শহরের এক গলিতে উনিশ'শ পঞ্চান্ন সালের এক সন্ধ্যা।

সেই গলিতে পৃথিবীকে আমন্ত্রণ করার জন্য সদ্য হেলসিংকি প্রত্যাগত একজন বক্তা উপস্থিত হয়েছেন। বক্তা নিজে একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। ঘরোয়া বৈঠকে তিনি এসেছেন নিজের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির কথা জানাতে।

হেলসিংকি থেকে বেরিয়ে সোবিয়েৎ রাশিয়ার বহু শহর ও জনপদ নিজের চোখে তিনি দেখে এসেছেন। সফর করে এসেছেন চেকোশ্লোভাকিয়া অবধি।

এক উজ্জ্বল স্মৃতিতে ভরপূর মন নিয়ে তিনি আবেগে বলতে আরম্ভ করলেন : "আমি নতুন মানুষের পৃথিবী দেখে এসেছি।"

বলতে বলতে তাঁর চোখে যেন স্বপ্নের আবেশ এসে গেল। এখনো টাট্‌কা রয়েছে স্মৃতি। দূরের একটি তাজা পৃথিবীর নদ-নদী-শস্যক্ষেত্র ও নরনারীর রৈখিক অবয়ব তাঁর মনের আর্শীতে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। তিনি যেন অভিভূতের মত আবার বললেন —"হাঁ, আমি নতুন মানুষের পৃথিবী দেখে এসেছি।"

"অভাব বিমোচনই শেষ কথা নয়," বক্তা বলে চললেন, "খাওয়া পরার অভাব মিটে গেলেই শেষ লক্ষ্যে পৌছানো গেলনা। রাজ্যে যদি সবাই ধনী হয়, সবাই যদি পান খেয়ে গান গেয়ে জীবন কাটাতে পারে, তবেই কি লক্ষ্যে পৌছানো গেল? শুধু ধনীদের জড় করে' দেশ পূর্ণ করলে সেটাই কি আদর্শ রাষ্ট্র হল?

"আমি এমন এক দেশের বহু শহর ও জনপদ দেখে এসেছি, যেখানে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির চরম উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা চলছে। মানুষকে অন্তরের সম্পদে ধনী করে দেবার জন্য রাষ্ট্র বসেছে সাধনায়। সেখানে জামাকাপড়ের হয়ত' বাহার নেই। কেননা, ওরা উপলব্ধি করেছে, জামাকাপড়ের বাহারই কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন অবস্থার

কেবল মাপকাঠি নয়। তা যদি হত, তবে খুনীদের ধরে' ধরে' দামী পোশাক পরিয়ে দিয়েই মনুষ্যত্ব উন্নয়নের বাহবা পাওয়া যেত।

"আমি যে গ্রাম-নগরগুলো পরিক্রমা করে এসেছি, তাদের নরনারীর ভেতর এক নতুন দৃষ্টি-ভংগীর বিকাশ দেখে এসেছি। মুখ্য এবং গৌণভাবে চাপ দিয়ে তাঁদের রাষ্ট্র কেবলই চেষ্টা করছে, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি অধিকতর প্রকাশমান হোক।

"তাই আমার কালোচামড়া এবং আমার দিশীভাষা নিয়ে যদৃচ্ছ ভাবে ওদের মধ্যে বিচরণ করতে পেরেছি। আমার দেশী পোশাক সেখানে অগৌরবের হয়নি। সেই শাদা চামড়ার নতুন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পৃথিবীর সকল রঙের সাধারণ মানুষের 'জন্য ভালোবাসায় ছাওয়া। আমি সগৌরবে এবং আনন্দে ওঁদের মাঝখানে বিচরণ করে' করে' অনুভব করেছি যে, ওঁরা ভালবাসায় উদার, মনীষায় মহৎ, মমতায় আত্মীয়ের মত।

"একটা জিনিস আমার আশ্চর্য লেগেছে। সে হচ্ছে, টাকার মোহ থেকে নতুন পৃথিবীর নরনারীরা আশ্চর্যভাবে মুক্ত। টাকা সেখানে মাটির মত। আমাদের দেশে অধ্যাত্মবাদীরা কাঞ্চনের মোহ থেকে মুক্তির জন্য ব্যক্তিগত যে আপ্রাণ আয়াস পান, সে মুক্তি সেখানে একেবারে সার্বজনীন এবং সুলভ হয়ে এসেছে।

"একবার ইংলণ্ড বা আমেরিকার দিকে চেয়ে দেখুন। সেখানে সমস্তের সেরা হচ্ছে টাকা। অর্থমূল্যই শ্রেষ্ঠ মূল্য। ওদের প্রবাদে আছে 'time is money' অথবা 'money is brighter than sunshine' কিংবা 'sweeter than honey.' আর সেই অর্থ-লাভের অর্থাৎ ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের জন্য ফ্রান্সে বা ইংলণ্ডে নরনারীর কী তাড়না। কত মামলা-মোকদ্দমা, কত জালিয়াতি, কত খুন, কত ট্রাজেডি। এবং তাই নিয়ে তাদের সাহিত্যের একটা অংগন ভরে' উঠেছে।

"আমাদের দেশের কোর্ট-কাছারিতে উকিল, মোক্তারের কত মিথ্যা মামলা সাজানোর বিড়ম্বনা লক্ষ্য করুন। সে দেশে এসব নেই। আর থাকবেই বা কেমন করে? ব্যক্তিগত অমিত সম্পত্তির প্রশ্ন যেখানে একেবারেই বাতিল হয়ে গেছে। তাইত জীবনের মিথ্যা অপচয় থেকে নতুন পৃথিবীর নরনারীরা একেবারেই মুক্ত। যেখানে বেকার নেই, ডাকাত নেই, বাটপাড় নেই, ভিক্ষাবৃত্তি নেই, কালোবাজার নেই, ফাটকা নেই।

"আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি সে-দেশকে, যে-দেশের সব কিছুই নতুন। যে-দেশে যৌন আবেদন বলতে কিছুই নেই। নারীদেহের ছবি দিয়ে যেমন বিজ্ঞাপন দেয়া হয় না, তেমনি রাস্তাঘাটে নারীরাও অংগের মহিমা প্রচার করে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যায় না। এবং অভাবে নারীকেও পতিতা হতে হয়না।

"আপনারা জিগগেস করছেন, সে দেশে সব চাইতে মান্য ব্যক্তি কারা? আমি বলব, শিল্পী, সাহিত্যিক, জ্ঞানী, গুণীরাই সে দেশে সুখী। ওঁদেরই সম্মান এবং জয়জয়কার সে-দেশে। তাতেই প্রমাণিত হয়, মানসিক উৎকর্ষের দিকে দেশ ঝুঁকে রয়েছে। ওঁদের গ্রাম-নগর একটু ঘুরলেই দেখা যায়, সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের নামে কত স্মৃতিস্তম্ভ ও পার্কের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।"

বক্তা থামলেন। থামলেন বটে, কিন্তু কথার ঢেউ ঐ ছোট্ট ঘরে থেমেও যেন থামলনা।

যদিও আজ আর রিপোর্টার নয়, তবু রাহুল ঐ ছোট্ট ঘরে উপস্থিত আছে। সে এতক্ষণ নীরবে নোট নিতে নিতে মনশ্চক্ষে দেখছিল নতুন মানুষের ঐ পৃথিবীকে। আর লক্ষ্য করছিল সেই সাংবাদিককে যিনি আজকার আসরে হেলসিংকি প্রত্যাগত বক্তা।

রাহুল মনশ্চক্ষে দেখছিল, কৃষ্ণ সাগরের নরম শুভ্র ঢেউয়ের কাছে

আতপ্ত বেলাভূমি। অথবা, শাদা উড়ন্ত মেঘের টোপর-পরা ইজিক-কুল হ্রদ। কিংবা, উরাল নদীতীরের ফুল-লতার আল্পনা-আঁকা কুঞ্জকানন। যেখানে গরমের ছুটিতে সকল স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে পঁচিশ লক্ষেরও বেশি অপরাজেয় কিশোর দুপদাপ করে বেড়াচ্ছে।

নতুন জনপদের একটা মধুর ছবি। যেখানে শিশুর মুখ রক্তিম ফুলের শোভাকেও হার মানায়। যে-দেশে আজো যেতে পারলনা রাহুল। অথচ, সে অপেক্ষা করে আছে, একদিন পরিব্রাজক হয়ে নতুন পৃথিবীতে যাবেই। এবং ততদিনে তার দেশও যদি ঐ নতুন পৃথিবীর মত গড়ে-উঠার সুযোগ পায়।

স্বপ্নমুগ্ধ রাহুল বৈঠক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরোয়া বৈঠক ভেংগে গেছে। এবার বাড়িতে ফেরার পালা।

তার আজব-শহরের রাস্তায় যতক্ষণ হেঁটে হেঁটে সে এগোতে লাগল, ততক্ষণ তার পরিচিত দৃশ্যপটকেও যেন আর এক নতুন মহিমার আলো ফেলে ফেলে দেখতে লাগল।

যে-বধূটি রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে, তার ফ্যাকাশে, বিবর্ণ মুখে আবার যেন জ্যোতি ফিরে আসছে। যে-কিশোর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পথ চলছে, তার শরীরে সহসা যেন রক্ত এবং মাংসের জোয়ার দেখা দিল। যে-মা বারংবার মৃত-বৎসা হতে হতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তিনি যেন হঠাৎ নতুন স্বাস্থ্যের বোধনে প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

স্বাস্থ্যের দীপ্তি, বুদ্ধির দীপ্তি, মমতার দীপ্তি, উদারতার দীপ্তি যেন ছোটাছুটি করতে লাগল রাস্তার উপর। আলেয়া নয়। সত্যি কী একটা যেন হয়ে গেছে আজব শহরে। কী একটা ঘটে গেছে।

ইতিমধ্যে কখন যে কটকের মেডিক্যাল কলেজ থেকে কংকাল-রূপিণী পারুল বেরিয়ে পড়েছে। চৌকিদার ছুটে' আর কংকালকে ধরতে পারল না। কংকাল ততক্ষণে সুন্দরী তরুণীতে রূপান্তরিত

হয়েছে। পারুল আজব শহরে ফিরে এসে' রাহুলের সামনে দাঁড়িয়েছে।

ফিরে এসেছে কবি মধ্যভারত থেকে। আর তাকে চুরি করে' পালিয়ে বেড়াতে হবেনা। দেশলাই বেচার কাজ থেকে তার মুক্তি হয়েছে। সে এখন জনপদের ছন্দে ছন্দে কবিতার মালা গাঁথবে। জীবনের সংগে জীবিকার শুভদৃষ্টি হবে। সুখী হবে অপরাজিতা।

বাড়ির চৌকাঠের সামনে এবার এসে পড়েছে রাহুল। সচকিত হল সে। কড়া নাড়তে হবে এখন। রাত কম হয়নি। ঘরে ভাত নিয়ে সেই বাস্তববাদিনী স্ত্রী বসে আছে। যে-স্ত্রী রাহুলের স্বপ্নকে কোনকালেই আমল দেয়নি।

আস্তে আস্তে দরজার কড়া নাড়ল রাহুল।